মৃত্যু-দূত

• সব্যসাচী •

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৫১

দাম—এক টাকা]

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

ব্রজেনকে লক্ষ্য করে শঙ্কর রিভলভার তুলে ধরল পৃঃ—৭৫

- মৃত্যু-দূত -

এক

ময়ূরকণ্ঠী হার

অসীম ব্যস্তভাবে ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বলল, "খুব জরুরী কথা আছে শঙ্কর। আজ ম্যাকেঞ্জির সেলে কতকগুলো জিনিষ-পত্রের নিলাম হচ্ছে। শুনেছি, এই নিলামে কতকগুলো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জিনিষ-পত্রও বিক্রি হবে। অতএব তোমার হাতের ঐ বাজে কাজ মুলতুবী রেখে চল, একবার না হয় একটু ঘুরেই আসা যাক।"

শঙ্কর ইজি-চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছিল। অসীমের কথা শুনে সে চোখ না তুলেই বলল, "তোমার কাজটা যে খুব জরুরী, তাতে আমারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে তোমার এই জরুরী কাজে আমাকেও দলে টানবার কোনও সার্থকতা আছে কি?"

অসীম একটু বিরক্ত ভাবে বলল, "ঐ তোমার এক দোষ শঙ্কর। বসে-বসে কতগুলো বাজে বই পড়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে আমার এই প্রস্তাবটা ঢের বেশী লোভনীয় নয় কি? তাছাড়া, খানিকটা বেড়ানও ত হবে।"

শঙ্কর বইখানা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে বলল, "চল। নেহাৎ যখন গোঁ ধরেছ তখন অন্ততঃ খানিকটা ভ্রমণের খাতিরেও তোমার সঙ্গে যেতে হবে বৈকি!"

ঘণ্টাখানেক নিলাম-ঘরে অপেক্ষা করেই শঙ্কর হাঁপিয়ে উঠল। বহুলোকের শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘরখানা গরম হয়ে উঠেছিল। শঙ্কর বিরক্তির স্বরে বলল, "আর কেন অসীম! এতক্ষণে তোমার নিলাম দেখবার সাধ মিটেছে বোধহয়? এবার লক্ষ্মীছেলের মত বাড়ীর দিকে ফেরা যাক, চল। বাড়ী গিয়ে আর কিছু হোক বা না হোক, নিঃশ্বাস নিয়েও অন্ততঃ প্রাণটা বাঁচবে। এত লোকের ভীড়ে আমার দম বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে! বহু-মূল্যবান্ ঐতিহাসিক দ্রব্যের নিলাম দেখে আমাদের কিছু রাজ্যলাভ হবে না!"

শঙ্কর আর অসীম ফিরে আসবার সময়ে নিলাম-ঘরের দরজার সামনেই একজন লোকের সাথে চোখোচোখি হতেই শঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সেদিকে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বলল, "দাশুবাবু! আপনি এই নিলামে কি মনে করে? আপনাদের মত মহৎ লোকের আবির্ভাব যেখানে-সেখানে হয় না। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আপনার আগমন হয়েছে। আপনার বেশভূষা আর বর্ত্তমান চেহারাও আমার এই ধারণা সমর্থন করবে।"

ডিটেকটিভ-ইন্স্পেক্টর দাশুবাবুর পরণে একখানি ময়লা

লুঙী, মাথায় একটা ময়লা টুপী, আর ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের মত হাতে তাঁর একটি চাবুক। দু-চোখে সুরমা-আঁকা, চিবুকে এক গোছা ছুঁচালো দাড়ি।

এই অপরূপ ছদ্মবেশে তিনি নিলাম-ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে স্থানটি বেশ নিরিবিলি—আর তখন পর্য্যন্ত লোকজনও খুব বেশী সেখানে জমা হয়নি।

শঙ্করের কথার উত্তরে একটু হেসে তিনি নিম্নস্বরে বললেন, "উদ্দেশ্য আছে একটা ঠিক,—তবে সেটা কি, তা জানবার সৌভাগ্য এখন পর্য্যন্ত আমারও হয়নি।"

শঙ্কর বলল, "আপনি নিলাম দেখতে এসেছেন, একথা বললে বিশ্বাস করব না নিশ্চয়ই ; এবং উদ্দেশ্য যে একটা-কিছু আছে তা আপনি নিজেই স্বীকার করছেন। অথচ সেটা কি, তা আপনি নিজেই জানেন না ?"

দাশুবাবু হেসে বললেন, "বাস্তবিকই তাই! এখানে আজ একটা বহু-মূল্যবান্ ময়ূরকণ্ঠী হার বিক্রী হবে শুনেছি। শুধু মূল্যের গুরুত্ব ছাড়া এর একটা ঐতিহাসিক বিশেষত্বও আছে। শোনা যায়, মোগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের কাছে এই হার ছিল। সেটা তিনি তাঁর বেগমকে উপহার দেন। তারপর নানা হাত ঘুরে কোনও উপায়ে সেটা অবশেষে এই নিলামে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই হারছড়ার জন্যেই আমি এসেছি।"

শঙ্কর বলল, "বটে! তাহলে শুধু ঐ হারছড়াই আপনার আগমনের হেতু ?"

দাশুবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "হাঁ, তাই বটে। কিন্তু সে-ও আমার একটা অনুমান মাত্র। সেকথা পরিষ্কার করে আমায় জানিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার ওপর আদেশ এইটুকু, আমি যেন বিলাসপুরের জমিদার অমর চৌধুরীর সঙ্গে-সঙ্গে থেকে গোপনে তাঁকে রক্ষা করে যাই। তাই এমন অপরূপ ভদ্রবেশে আমি তাঁর গাড়ীর পিছু-পিছু আর-একখানি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়ে এসেছি; আবার সেই ভাবেই তাঁকে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাব।"

শঙ্কর বলল, "তা হলে তো বেশ কাজ জুটিয়েছেন দেখ্‌ছি! কিন্তু কে সেই বিলাসপুরের জমিদার অমর চৌধুরী? এখানে আছেন তিনি?"

"হাঁ," বলে দাশুবাবু তাঁর চোখের একটি ক্ষুদ্র ইসারায় এক সুবেশ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন।

অসীম ও শঙ্কর দু'জনেই তাঁকে বেশ করে দেখে নিলে; দেখে সহজেই তারা বুঝে নিলে, হাঁ জমিদার বটে! জমিদারের মতই চেহারা—তেম্‌নি বেশভূষা!

এমন সময়ে সেই বিখ্যাত ময়ূরকণ্ঠী হারের ডাক আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে এক নিমিষে ঘরের ভেতরে সব চুপ—সকলের একাগ্র দৃষ্টি ঐ হারটার ওপর!

নেকলেসটার ডাক ক্রমে সাঁইত্রিশ হাজারে উঠ্‌ল। দেখা গেল, মাত্র দুজন ছাড়া অন্য সবাই নিরস্ত হয়েছে। সবাই একে-একে নেকলেসটির আশা ত্যাগ করলেও দুজনের মধ্যে তখনও

জোর ডাক চলছিল। ক্রমে তার ডাক পঁয়তাল্লিশ হাজারে এসে থামল।

এতক্ষণ সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই নেকলেসের ডাক শুনছিল। এখন সেটা থামতেই চারদিকে একটা অস্ফুট গুঞ্জন আরম্ভ হল।

শঙ্কর বলল, "বিলাসপুরের জমিদারের জিদই বজায় রইল দেখছি। আর একজন কে ডাকছিলেন ঐ নেকলেসটার জন্যে?"

দাশুবাবু ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন, "ঐ ভদ্রলোক।"

ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। সৌম্যমূর্ত্তি—মাথায় কোঁকড়া কালো চুল—মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ঐ নেকলেসটা না পাওয়াতে তিনি যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন; কিন্তু সে ভাব যথাসম্ভব দমন করে তিনি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে অদৃশ্য হলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরই প্রায় পেছনে-পেছনে আর-একটি লোক ভীড় ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শঙ্কর বলল, "অসীম, শীগগির চল। হয়তো হাতে একটা কাজ পেয়ে গেছি! ওদের পিছু-পিছু আমাদেরও ছুটতে হবে দেখছি।"

এই বলে সে অসীমকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার পেছনে আসতে ইঙ্গিত করেই উঠে দাঁড়াল।

দাশুবাবু কাছেই ছিলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি শঙ্কর! এরই মধ্যে? এত ব্যস্ততা কেন?"

একটু হেসে শঙ্কর বলল, "আপনি যান বিলাসপুর, আর আমি যাচ্ছি বিষাদ-নগর।" এই বলেই সে আর কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে বাইরে বেরিয়ে এলো। কিন্তু এত ভীড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে তাদের বোধ হয় কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিল; কাজেই চেষ্টা করেও তারা আগেকার লোক দু'জনের খুব কাছাকাছি ঘেঁসতে পারলে না।

শঙ্কর ও অসীম দেখতে পেলে, তাদের মধ্যে ভদ্রবেশী লোকটি একখানি রিক্‌শায় বসে আছে, আর সেই রিক্‌শা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অপর লোকটি।

রিক্‌শা তখন পূরো দমে ছুটে যাচ্ছে,—সাধ্য কি যে শঙ্কর বা অসীম তাদের নাগাল পায়!

শঙ্কর এক মুহূর্ত্ত কি একটু ভাবল! তারপর অসীমকে বলল, "তুমি বরাবর বাড়ীর দিকে চলে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

এই বলে সে তখনই তার হাতঘড়ীটি হাত থেকে খুলে নিয়ে, সেটি হাতে করে চেঁচাতে লাগ্‌ল, "ও মশাই, কি ফেলে গেছেন দেখুন। আপনার জিনিষ,—ও মশাই, আপনার জিনিষ—"

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্কর সেই রিক্‌শা গাড়ীর ভদ্রলোককে ডাক্‌তে-ডাক্‌তে গাড়ীখানি লক্ষ্য করে সেইদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

গাড়ীর আরোহী ভদ্রলোকটি শঙ্করের ডাক শুনে পেছন

ফিরে তাকালেন, তারপর রিক্শাওয়ালাকে কি বলতেই সে গাড়ী থামিয়ে, সেইখানেই শঙ্করের অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল।

শঙ্কর প্রাণপণে ছুটে, রিক্শার কাছে পৌঁছে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "মশাই, আপনি যেখানে রিক্শায় চেপেছিলেন, সেইখানে এই ঘড়ীটা পড়ে ছিল। হয়তো আপনার হাত বা পকেট থেকে এটা খুলে পড়েছে, আপনি টের পান নি। ঘড়ীটা আপনার তো? নিন্—তাহলে আপনার ঘড়ীটা নিন্।"

আরোহী ভদ্রলোকটি একবার লুব্ধভাবে ঘড়ীটার দিকে তাকালেন, তারপর সেটি হাতে নিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ মশায়, আপনাকে ধন্যবাদ! আমার খুব বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল, আপনি তা থেকে বাঁচালেন। এজন্য আপনাকে কোন পুরস্কার দিতে পারি কি?"

বলতে-বলতে তিনি তাঁর মানিব্যাগ বার করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, "না—না, ও আপনি কি কথা বলছেন? ছিঃ! আমি কি পুরস্কারের লোভে আপনার ঘড়ীটা দিচ্ছি! আমি বুঝতে পারলুম, আপনি বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে আছেন, হয় তো মনে কোন ব্যথা চেপে আছে! কাজেই আর কোন দিকে আপনার হুঁশ নেই—ঘড়ীটা যে খুলে গেছে, তা আপনি টেরই পেলেন না!"

"হাঁ, হাঁ,—আপনি ঠিক বলেছেন। বাস্তবিকই একটা ব্যাপারে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে—কাজেই আমি এর বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারি নাই।"

এই বলে ভদ্রলোক পুনরায় শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি যে কিছুই প্রতিদান নিতে চাইছেন না! আমি যে তাহলে ঋণী থেকে যাব আপনার কাছে! আচ্ছা, একদিন যাবেন আমার বাড়ী? সেখানে চা খেতে-খেতে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করা যাবে।

এই মাইল খানেক দূরেই আমার বাড়ী—৪৩নং মলঙ্গা লেন। দয়া করে যাবেন একদিন?"

শঙ্কর পরম আগ্রহে উত্তর দিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই যাব। দু' একদিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

"আচ্ছা, মনে থাকে যেন," এই বলে আরোহী ভদ্রলোক হাত তুলে শঙ্করকে সম্বোধন করে বললে, "নমস্কার!" শঙ্করও প্রতি-নমস্কার জানিয়ে তখনই আবার পেছনের দিকে রওয়ানা হল।

সে কেবল দশ-পনেরো পা এগিয়েছে, এম্‌নি সময় তার পেছন থেকে হঠাৎ একখানি সাইকেল আরোহী-সমেত তার প্রায় কাঁধে এসে পড়লো—শঙ্কর পড়ে গেল।

সে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সাইকেলের আরোহী বিনীতভাবে বললে, "মাপ করবেন মশাই! হঠাৎ পড়ে যেয়ে আপনাকেও ব্যথা দিয়ে ফেলেছি। তা য়াহোক্, কিছু মনে করবেন না। এই চিঠিখানা নিন্, বাড়ী গিয়ে পড়বেন।"

এই বলেই একখানি ছোট লেপাফা তার হাতে গুঁজে দিয়ে, সে তখনই সাইকেলে চেপে বিদ্যুদ্‌বেগে চলে গেল।

শঙ্কর অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে তখনই চিঠিখানা খুলে ফেল্‌লে, আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলে না।

খামখানি খুলতেই দেখলে তার ভিতর ছোট্ট একখানি চিঠি। তাতে লেখা রয়েছে,—

"সাবধান গোয়েন্দা-প্রবর! তোমার এত কৌতূহল ভাল নয়। লাভ তো কিছুই হল না, বরং নিজের ঘড়ীটা হাতছাড়া হয়ে গেল!"

চিঠির নীচে কারো কোন নাম নেই—একেবারে সাদা!

শঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে ভাবলে, "সত্যই কি তাহলে কোন ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছি? নইলে, দু' মিনিট যেতে না-যেতেই এমন চোখ রাঙানী! কিন্তু লাভ কি আমার কিছুই হয় নি?—হয়েছে বই কি! রিক্‌শা গাড়ীর নম্বর পেয়েছি ১২৩, গাড়োয়ানের মুখ চিনে নিয়েছি, আরোহী ভদ্রলোকের মুখও মুখস্থ হয়ে গেছে—ময় তার কথা বলার ধরণ-ধারণ, স্বভাব-চরিত্র পর্য্যন্ত!

পরের ঘড়ীটা নিজের বলে দাবী করে নিতেও তাঁর কিছুমাত্র লজ্জা হল না? এসব লোক না পারে কি?

এই যে এত সব অভিজ্ঞতা, এর কি কোন দাম নেই?—নিশ্চয়ই আছে। তা হলে আর লাভ হল না কেমন করে? লাভ হয়েছে বই কি!

যাহোক্, এখন দেখছি আজকের বেড়ানোটা একেবারেই বৃথা হয়নি। ময়ূরকণ্ঠী হারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্র

গজিয়ে উঠ্ছে নিশ্চয়। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়! আজকের রাতটা বিলাসপুরের জমিদারবাবুর পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে পার হবে কি না কে জানে?"

শঙ্কর আরো কত কি ভাবতে-ভাবতে নিজ-মনে হেঁটে চল্‌ল বাড়ীর দিকে।

বাড়ী যেয়ে সে যখন পৌঁছল, রাত তখন আটটা বেজে কয়েক মিনিট।

দুই

শাজাদা হুসেন

রাত তখন দশটা পেরিয়ে গেছে। শীতকালের রাত দশটায় কলকাতা সহরেরও অনেক পাড়া প্রায় নিঝুম হয়ে যায়,—লোকজন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। মলঙ্গা লেনও এইরকম একটি পাড়া।

এত রাতে পাড়ার প্রায় সবাই ঘুমে অচেতন। কদাচিৎ দু'একটা বাড়ীতে লোকজনের কিছু সাড়া পাওয়া যায়। মাঝে-মাঝে দু' একটি কুকুরের চীৎকার, চানাচুর-ওয়ালার হাঁক্ আর মুস্কিল-আসানের সু-উচ্চ ঘোষণা—অধিবাসীদের শান্তি-নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাচ্ছিল।

"ইয়া পীর, মুস্কিল-আসান! যাঁহা মুস্কিল, তাঁহা আসান্"—বলতে-বলতে এক ফকীর সেই পাড়ায় এসে ঢুক্‌ল।

তার দীর্ঘ পক্কশ্মশ্রু, লম্বা চেহারা ও আভূমি ঝোলানো আলখাল্লা, আর তেলের সুদীর্ঘ চেরাগ, রাস্তার কুকুরগুলিকে যেন সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল! একপাল কুকুরও তার পিছু-পিছু অনুসরণ করে, বিপুল আর্ত্তনাদ করে, তার অনধিকার-প্রবেশের প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

ফকীর সাহেব দু' একবার এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে শেষে এক

প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকে এসে দাঁড়াল, আর দাঁড়িয়ে তখনই আর-একবার হেঁকে উঠল, "ইয়া পীর মুস্কিল-আসান! যাঁহা মুস্কিল, তাঁহা আসান্!"

দরজার কাছে আসতেই দরোয়ান বললে, "এখানে কিছু হবে না বাবা, মাপ করো।"

ফকীর তার লম্বা দাড়ির ভিতর দু'একবার আঙুল চালাতে-চালাতে বললে, "হবে না? কিছুই হবে না? ফকীর দরবেশ আমি—হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাকে সম্মান করে, সবাই আমার আশীর্ব্বাদ চায়। বাড়ীর ছেলে-বুড়ো কেউ ত' আমায় কখনো হাঁকিয়ে দেয় না বাবা! পীর মুস্কিল-আসানের এই দোয়া-মাখা চেরাগের তেল সবাই যত্নে তাদের ঘরে রেখে দেয়। আর তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ এখানে না-দাঁড়াতেই! কে তুমি বাবা? তুমি হিন্দু, না মুসলমান?"

দরোয়ান বুঝি একটু নরম হয়ে গেছিল। সে কিছু সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিলে, "আমি মুসলমান, ফকীর সাহেব!"

"মুসলমান!" ফকীরের সুরমা-মাখা বড়-বড় চোখ দুটি কপালে উঠে গেল! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে বললে, "আপ্ মুসলমান হো? দুনিয়ামে আউর কোই মুসলমান, হাম্‌কো কোভিহি এতনা দাগা নেই দিয়া জী!"

ফকীর আবার তার বাংলা বুলি আরম্ভ করলে, "বাবা জমাদার সাহেব! আমিও মুসলমান। কিন্তু এই তামাম্ কলকাতা সহরের হিন্দুরা পর্য্যন্ত আমায় সম্মান করে, আর

তুমি মুসলমান হয়ে আমায় তাড়িয়ে দিতে চাও? এযে বড় তাজ্জব ব্যাপার! তোমার মনিব কি হিন্দু, না মুসলমান?"

দরোয়ান এবার বড়ই লজ্জিত হল। সে বললে, "তিনিও মুসলমান।"

ফকীরের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। সে বললে, "আমি তা আগেই অনুমান করেছিলাম।"

দরোয়ান বিস্মিত হল। সে বললে, "আপনি আগেই অনুমান করেছিলেন! কিন্তু—তা কেমন করে? এই বাড়ী দেখে কেউ মুসলমানের বাড়ী বলে বুঝতে পারে, তেমন একটা চিহ্নও তো রাখা হয়নি ফকীর সাহেব! তিন-তিনটে তুলসী গাছের টব দিয়ে বাড়ীখানাকে একেবারে হিন্দু-বাড়ী করে তোলা হয়েছে। তবু আপনি বলছেন, আপনি আগেই অনুমান করেছিলেন যে এটা মুসলমানের বাড়ী! কেমন করে অনুমান করেছিলেন ফকীর সাহেব?"

প্রশান্ত হাসিতে ফকীরের মুখ-মণ্ডল আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে বললে, "কেমন করে? সে তো খুব সোজা কথা।

বাবা, তামাম্ কলকাতা আমি ঘুরে বেড়াই—কত হাজার-হাজার হিন্দু-বাড়ীতেও আমার অবাধ গতি। তাদের মাঝে লাখপতি কোটিপতিরও অভাব নেই। কিন্তু ক'টা বাড়ীতে এমন তখমা-আঁটা উর্দ্দী-পরা দরোয়ান থাকে?—খুবই কম। সে কেবল আমাদের মুসলমান আমীর-ওমরাওদের বাড়ীতেই দেখা যায়।

আরে বাবা, গোটা দেশটা এখন ইংরেজের হলেও, নবাবী চালটা এখনো মুসলমানের ঘরেই আছে। হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের টাকা কম হলেও, মুসলমান জানে এখনো যে, কেমন করে তার নবাবী চাল ও ভদ্রতা বজায় রাখতে হয়। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে এই একটা মস্ত-বড় পার্থক্য।

হিন্দু তার আগেকার ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু মুসলমান আজও ভুলতে পারেনি যে, এককালে তারাই ছিল এই সারা দেশটার বাদশাহ্‌। কাজেই তাদের চাল-চলনটা, সুযোগ পেলেই ফুটে বেরুয় সেই আগেকার শাজাদা-বাদ্‌শাদের মত।”

ফকীরের কথাগুলো শুন্‌তে-শুন্‌তে দরোয়ানের মুখখানিও খুশীতে ভরপূর হয়ে উঠ্‌ল। সে বললে, “আপনি ঠিক বলেছেন ফকীর সাহেব! আপনার অনুমানও খুবই সত্য। আমার মনিবও একজন শাজাদা। শাজাদা হুসেন এঁর নাম। এককালে ওঁরই পূর্ব্বপুরুষের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেব।”

“সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেব! ভারত-সম্রাট্‌ শাহানশাহ্‌ আলমগীর বাদ্‌শাহ্‌ ঔরঙ্গজেব!”

ফকীর তার হাত দুটি যোড় করে, ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকিয়ে, ভক্তি ও বিস্ময়ের স্বরে অভিভূত ভাবে বললে, “ইয়া খোদা মেহেরবান্‌!”

এই সময় দোতলার এক অন্ধকার ঘর থেকে কে একজন গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, “সুলতান্‌!”

"জী!" বলেই দরোয়ান তখনই মিলিটারী কায়দায় সেই দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

ওপর থেকে হুকুম হল, "ফকীর-সাহাব কো হিঁয়া লে আও।"

"যো হুকুম!" বলেই দরোয়ান তখনই ফকীরকে বললে, "তাহলে চলুন ফকীর সাহেব, ওপরে চলুন। আপনার বরাৎ খুলে গেছে। বাদ্শাজাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

ভয়ে ও সঙ্কোচে ফকীরের মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে গেল। দরোয়ান তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই ফকীর সাহেব! বাদ্শাজাদা বুঝি আপনার সব কথাই এতক্ষণ শুনে থাক্‌বেন! আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—হয়তো দু'এক আশরফি বখশিস্ মিলে যাবে। চলুন, আপনাকে ওপরে নিয়ে যাই।"

ফকীর উঠে দাঁড়াল। তারপর দরোয়ানের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতে লাগ্‌ল। যাওয়ার আগে দরোয়ান তার ফটকে তালা দিতে কিছুমাত্র শৈথিল্য করলে না।

শাজাদা হুসেনের ঘরে ততক্ষণে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে। ফকীর সাহেব, দোর-গোঁড়ায় পৌঁছুতেই শাজাদা হুসেন তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আইয়ে—আইয়ে ফকীর-সাহাব! আইয়ে অন্দর্।"

ফকীর সাহেব ঘরে ঢুকে বিস্মিত ভাবে দাঁড়াতেই পরিষ্কার

বাংলায় শাজাদা বললেন, "বসুন, ঐ কুর্শীতে বসুন।" এই বলে তিনি একখানি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

ফকীর তাঁর আমন্ত্রণে চেয়ারে বসলো, তারপর হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে বললে, "আল্লা আপ্‌কো ভালা করে! আমায় কেন তলব করেছেন শাজাদা?"

একটু হেসে শাজাদা বললেন, "আমি আপনাদের সব কথাই শুনতে পেয়েছি। আপনি খুব চালাক-চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলেই মনে হল। তা নইলে, উর্দ্দী-পরা দরোয়ান দেখেই কি এটা মুসলমানের বাড়ী বলে অনুমান করতে পারেন? কিন্তু মুসলমান হ'লেও আপনি বাঙ্গালী মুসলমান। কেমন, তাই নয় কি?"

—"হাঁ জী!" ফকীর সংক্ষেপে জবাব দিলে।

—"কোথায় আপনার দেশ?"

—"ফরিদপুর।"

—"কিন্তু কথাবার্ত্তায় আপনাকে তো এদেশী, মানে পশ্চিমবঙ্গের বলে মনে হচ্ছে।"

—"কথাবার্ত্তায় কি সব ধরা যায় শাজাদা? আমি আজ চল্লিশ বছর এই কলকাতা সহরেই কাটাচ্ছি। দুনিয়ায় কেউ তো আমার নেই শাজাদা! বাপ-মা কবে মরে গেছে! ভাই-বোন্‌দের বিয়ে হয়ে গেছে। আর আমি তো বিয়ে-থাওয়াই করিনি—আমার আবার বাড়ী-ঘরই বা কি, আর দেশই বা কি? কোনো কালে বাড়ী ছিল ফরিদপুর। কাজেই কেউ জিজ্ঞেস্ করলে সেই ঠিকানাই বলতে হয়।

এতদিন যে কলকাতায়ই কাটাচ্ছে, কথাবার্ত্তায় কেমন করে তাকে ধরবেন শাজাদা? আপনার এই বাংলা বুলি শুনলে, কেই বা বুঝতে পারে যে, আপনিও বাঙ্গালী নন?—সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বংশধর আপনি,—নিশ্চয়ই আপনি এই বাংলা-দেশকে নিজের দেশ বলে দাবী করবেন না?"

শাজাদা হুসেন বললেন, "না, তা কখ্খনো করব না বটে।"

শাজাদা কি একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা ফকীর সাহেব! আপনার মত চালাক-চতুর লোকের আমার কিছু দরকার আছে! আপনি আমায় একটু সাহায্য করবেন?"

ফকীর এবার আশ্চর্য্যান্বিত হল। সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করব! কি সাহায্য শাজাদা? আপনার কোন উপকার করতে পারলে আমি খুবই খুশী হব। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি সংসার-ত্যাগী ফকীর মাত্র। আল্লার নাম করে, পীর মুস্কিল-আসানের নাম করে—জীবনের প্রায় সবকটা দিনই কাটিয়ে দিয়েছি। এখন আর সাংসারিক জীবের মত সংসারে ফিরে যেতে পারব না। আমাকে দিয়ে আপনার কোন্ উপকার হতে পারে শাজাদা?"

—"বন্দেগী জনাব!" বলে এই সময় একজন লোক এসে শাজাদা হুসেনকে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—"কি খবর আবদুল?"

—"হুজুর, রাত সাড়ে এগারোটা হয়ে গেছে। আর খানিক পরেই ত' বেরুতে হবে ?"

—"হাঁ, হাঁ, তৈরী হয়ে নে।"

—"এখন নম্বর হবে কত হুজুর ?"

—"নম্বর ?" বলে শাজাদা কি খানিকক্ষণ ভাবলেন। মুহূর্ত্ত পরেই বললেন, "কত নম্বর আঁটা আছে ?"

—"আজ্ঞে ১২৩।"

—"বেশ, এবার তাহলে একদম উল্টে দে—৩২১ নম্বর। যা, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নে।"

এই বলে শাজাদা তখনই ফকীরকে লক্ষ্য করে বললেন, "আচ্ছা ফকীর সাহেব, আজ আর এখন কথা কইব না। আস্‌ছে শনিবার দিন যদি একবার এইখানে আসেন, তাহলে অনেক কাজের কথা কইব। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ লাভ করলুম।

আপনাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি না ফকীর সাহেব! বিশেষতঃ এইই যখন আপনার উপজীবিকা। বর্ত্তমানে এই নিন।"

এই বলে তিনি একটি মোহর ফকীরের পাত্রে ফেলে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ফকীর শশব্যস্তে চীৎকার করে উঠ্‌ল, "আঃ, করলেন কি শাজাদা ?"

শাজাদা তাঁর অপরাধ কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, "কেন, কি হয়েছে ?"

—"আপনি একটি সোনার আশরফি দিচ্ছেন! এতে আপনার মহানুভবতা ও উদারতা ফুটে উঠছে বটে! কিন্তু আমার বিপদ্ এতে বেড়ে গেল শাজাদা!"

—"কেন? এতে আবার বিপদ্ কি?"

—"বিপদ্ নয়? গরীব ফকীর আমি। একটা সোনার আশরফি নিয়ে আমি কি করব? আর তা ভাঙাতে গেলেই যে আমায় পুলিশে ধরে নেবে চোর সন্দেহ করে!"

—"ওঃ! সেই কথা!" এই বলে শাজাদা হুসেন একবার 'হোঃ! হোঃ!' করে হেসে উঠ্লেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা, সেজন্য ভাববেন না আপনি। আমি একখানি কাগজে লিখে দিচ্ছি যে, একটি আশরফি আমি আপনাকে সেলামী দিয়েছি।"

এই বলে তিনি তখনই দেরাজ টেনে একখানি চিঠির কাগজ বার করে তাতে ইংরেজীতে সেই মর্ম্মে কয়েক লাইন লিখে দিয়ে, হাসিমুখে তাকে বললেন, "নিন্ ফকীর সাহেব! এখন আর কারো সাধ্য নেই যে আপনাকে কোন ফ্যাসাদে ফেলে!"

ফকীর সাহেব কাগজখানি তার হাত পেতে নিয়ে, মাথায় ঠেকিয়ে, তখনি তার লম্বা আলখাল্লার মাঝে কোথায় পূরে রাখলে!

শাজাদা উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দরোয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও, ফকীর সাহেবকে বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসো।"

এই বলে শাজাদা হুসেন তাকে ভক্তিভরে প্রণতি জানালেন, ফকীরও দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে বললে, "আল্লা আপনার মঙ্গল করুন।"

ফকীর যখন বেরিয়ে এলো, সারা মলঙ্গা লেন তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার একবার হাঁকলো, "ইয়া পীর মুস্কিল-আসান্! যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান্! ইয়া পীর!—"

তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে না যেতেই,—ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে কর্কশ কণ্ঠে কে পেছন থেকে চীৎকার করে ডাক্‌ল, "এই মুস্কিল-আসান! ঠারো। দাঁড়াও।"

স্পষ্ট টের পাওয়া গেল, কথার সঙ্গে কে যেন ফকীরকে লক্ষ্য করে সেইদিকে ছুটে এলো!

ফকীর চট্ করে একদিকে সরে গিয়ে, একটা বাড়ীর এক থামের পেছনে আত্মগোপন করে দাঁড়াল।

লোকটি অন্ধকারে ফকীরকে দেখ্‌তে না পেয়ে যেন আরো ক্ষেপে গেল! সে তার পেছনের লোকটিকে লক্ষ্য করে বললে, "আপনি এত অসাবধান শাজাদা! শেষকালে একটা গোয়েন্দা ঘুঘুকে বাড়ীতে ঢুকিয়ে, বাড়ীর পথ-ঘাট দেখিয়ে দিলেন! লোকটা আরো কত কি জেনে গেল, কে জানে?"

শাজাদা বললেন, "আমি কি করে বুঝব যে, এই লোকটাই সেই গোয়েন্দা? একটু সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু আলাপ করে, আমার সব সন্দেহ আরো দূর হয়ে গেল!

চমৎকার নির্লোভ দরবেশ, দিব্যি শান্ত মুখমণ্ডল! তা যাহোক্, আপনি কি করে জান্‌লেন যে, এই হচ্ছে সেই শঙ্কর গোয়েন্দা?"

—"বাঃ আমি যে আবার ওসব গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছি শাজাদা! আমি জানতে পারলুম যে, শঙ্কর তার বাড়ীতে নেই,—থানায় নেই,—ইন্‌স্পেক্টর দাশুবাবুর বাড়ীতেও নেই। তাহলে সে আর যাবে কোথায়? অথচ, আপনি তাকে দিব্যি ভদ্রলোক মনে করে, নিজের আসল ঠিকানা ৪৩নং মলঙ্গা লেন পর্য্যন্ত বলে দিয়েছিলেন!

কাজেই সহজে বুঝে নিলুম যে, সে আমাদের এদিকে ছাড়া আর কোথাও নেই। আর আসতেই ত আপনি বললেন, চমৎকার এক দরবেশ এসেছিল; তাকে দিয়ে হয়তো আপনার কত কাজ করিয়ে নিতে পারবেন!

তখনি বুঝলুম, এ নিশ্চয়ই সেই গোয়েন্দা ঘুঘু! কিন্তু— গেল কোথায় লোকটা? যা অন্ধকার! শীগ্‌গির একটা টর্চ্চ নিয়ে আসা যাক্। হতভাগা এখনো নিশ্চয়ই পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেনি। যাবে কোথায়? ওকে খুঁজে বার করব নিশ্চয়।"

কথা কইতে-কইতে শাজাদা হুসেনকে নিয়ে সে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল; তারপর চীৎকার করে বললে, "সুলতান! দুটো টর্চ্চ নিয়ে এদিকে আয় শীগ্‌গির।"

লোক দুটো খানিকটা এগিয়ে যেতেই ফকীর-বেশী শঙ্কর

গোয়েন্দা তার নকল দাড়ি ও লম্বা আলখাল্লা সব-কিছু খুলে ফেলল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক কুলীর পোষাক !

মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে তার মুখমণ্ডলে ও সারা দেহে কি একটা গুঁড়ো রং মাখিয়ে নিলে ! সঙ্গে-সঙ্গে তার সুগৌর দেহ তামাটে রঙে পরিণত হয়ে গেল। তারপর কাছেই গলি হাত্‌ড়ে সে একটা গাছের মোটা ডাল যোগাড় করে, তাই মাথায় নিয়ে, স্বচ্ছন্দে সে গলির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। তার ফকীরের পোষাক সেই মলঙ্গা লেনেই পড়ে রইল।

শাজাদা [illegible]সেন ও তার সহকারী তখনও তাঁদের আশে-পাশে ফকীর সাহেবের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন। গোয়েন্দা শঙ্কর তাঁদের ঠিক সম্মুখ দিয়েই মোট মাথায় নিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এসে পড়ল।

শঙ্কর অনেকটা দূরে এসেও বুঝতে পারলে যে, সারা মলঙ্গা লেন তখন টর্চ্চের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, আর মাঝে-মাঝে নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করে কারা যেন চীৎকার করছিল, "চোর ! চোর !"

তিন

অদ্ভুত মৃত্যু

রাত তখন বারোটা। শঙ্কর ব্যস্তভাবে দাশুবাবুর বাড়ী এসে উপস্থিত হল। তাকে এই অসময়ে উপস্থিত হতে দেখে দাশুবাবু একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

শঙ্কর কোনও ভূমিকা না করেই বলল, "শীগ্‌গির দাশুবাবু! তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। এখুনি বেরোতে হবে।"

দাশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই রাত বারোটার সময়ে আবার কি খেয়াল চাপল তোমার মাথায়? কোথায় যেতে হবে?"

শঙ্কর অধীর হয়ে বলল, "সব কথা বলবার সময় নেই দাশুবাবু! কেবল এটুকু শুনে রাখুন যে, বিলাসপুরের জমিদার অমরবাবুর বাড়ীতে আমাদের এখনই যাওয়া দরকার। ভদ্রলোক এখনো জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ!"

দাশুবাবু আর কোন কথা না বলে শঙ্করের সাথে বিলাস-পুরের জমিদার অমর চৌধুরীর বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। তাঁরা সবাই যখন তাঁদের গন্তব্য স্থলে এসে পৌঁছুলেন, রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা।

শঙ্কর আব্‌ছা-অন্ধকারের ভেতরে চারদিকে তাকিয়ে বললে, "এখানেই কোনো একটা সুবিধে মত জায়গায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

দাশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অপেক্ষা তো করব ; কিন্তু কার জন্য এই অপেক্ষা ? অমরবাবুকে কেউ মারবার মৎলবে আছে নাকি শঙ্কর ?"

শঙ্কর বলল, "হাঁ। তবে আমার চেয়ে আপনারই সেই আশঙ্কা করা উচিত ছিল বেশী। কারণ, তাঁর জীবনের কোন আশঙ্কা না থাকলে, নিলাম-ঘরে তিনি একজন দেহরক্ষীর প্রার্থনা করেছিলেন কেন বলতে পারেন ? আর সেই দেহরক্ষীর ভার পেয়েছিলেন আপনি নিজে। কাজেই সর্ব্বাগ্রে আপনারই বোঝা উচিত ছিল যে, অমন দামী ময়ূরকণ্ঠী হারের ক্রেতা অমর-বাবুর জীবন কখনো নিরাপদ নয়।"

দাশুবাবু কিছু লজ্জিত হলেন। তাঁরও মনে হল, "তাইত, এমন যে একটা হতে পারে, এ ধারণা আগেই আমার হওয়া উচিত ছিল।"

চারদিক অন্ধকার—নিঝুম। জেগে আছে কেবল মোহনলাল ষ্ট্রীটের দুরন্ত মশাগুলি, আর গোয়েন্দা শঙ্কর ও ইন্‌স্পেক্টর দাশুবাবু। কিন্তু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করাই সার হল। লোকজন ত দূরের কথা, কোন একটা নিশাচর পাখীও দেখা গেল না।

ক্রমে রাত আরো বেড়ে চলল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বলল,

শঙ্কর দ্রুতপদে কাছে এসে দেখল—তিনি মৃত ! [পৃঃ—২৬

"রাত প্রায় দুটো! চলুন একটু এগিয়ে দেখা যাক ব্যাপার কি!"

দুজনে অন্ধকারে সতর্কভাবে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল।

নীচেকার একটা ঘরের জানলা খোলা। সেদিকে তাকিয়ে শঙ্কর বলল, "ব্যাপার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। আততায়ী আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে উধাও হলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!"

শঙ্কর দেয়াল টপ্‌কে সেই ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। দাশুবাবুও তার অনুসরণ করে সেই ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকেই তারা দেখতে পেল, ঘরের মাঝখান থেকে একটা টর্চ্চের আলো দেয়ালের ধারে একটা লোহার সিন্ধুকের ওপর গিয়ে পড়েছে।

এই দৃশ্য চোখে পড়তেই শঙ্কর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বললে, "শাজাদা হুসেন! আপনি আমাদের আগেই এসে উপস্থিত হয়েছেন দেখছি! কিন্তু বড় অসময়ে এখানে এসে পড়েছেন। আপনাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি যে, কোনও চালাকী করবার চেষ্টা করবেন না। করলেও কিছু ফল হবে না—আমরা অভ্যর্থনার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছি।"

শঙ্করের এই সাবধান-বাণীর কোনো উত্তর এলো না। চারদিক আগেকার মতই নিস্তব্ধ। টর্চ্চের আলোও আগের মত সেই সিন্ধুকটার ওপর থেকে একচুল এদিক-ওদিক নড়ল না।

শঙ্কর কোনো কথা না বলে ইলেকট্রিক লাইটের স্থইচ্‌টা খুঁজে ঘরের আলো জ্বাল্‌ল। ঘরের অন্ধকার দূর হতেই তারা দেখতে পেল, ঘরের মাঝখানে একটা ইজি-চেয়ারে বসে আছেন স্বয়ং অমর চৌধুরী, আর কিছু দূরেই একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে—তার হাতে একটা টর্চ্চ। টর্চ্চের বোতামটা বেশ করে টেপা ছিল বলে তখনো তা জ্বলছে।

একটা কিছু সন্দেহ করে শঙ্কর দ্রুতপদে অমর চৌধুরীর কাছে এসে পরীক্ষা করে দেখল—তিনি মৃত। তারপর হুমড়ি-খেয়ে পড়া লোকটার মুখ দেখেই সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "একি অদ্ভুত ব্যাপার! এ যে সেই শাজাদা হুসেনের রিক্‌শা গাড়ীর ড্রাইভার! জমিদার অমর চৌধুরী ও রিক্‌শা-ড্রাইভার দুজনেই মৃত!"

দাশুবাবু এত সব ব্যাপারের কিছুই জানেন না। কে যে শাজাদা হুসেন, আর কেই বা তাঁর রিক্‌শাওয়ালা,—এসব কিছুই তিনি জানেন না। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বল্‌ছ কি শঙ্কর? আর কে এই রিক্‌শাওয়ালা? আমি যে তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি নে!"

ঈষৎ হেসে শঙ্কর বলল, "তা বটে, আপনার কাছে এ সব হেঁয়ালীর মতই মনে হবে।"

এই বলে শঙ্কর সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিয়ে বললে, "এই লাশ দুটোর একটা বন্দোবস্ত করেই আপনার এখন সবচেয়ে বড় কাজ হবে কি জানেন দাশুবাবু? এখন সবচেয়ে

বড় কাজ হবে ৪৩নং মলঙ্গা লেনের সব কটাকে এই মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার করা।

কিন্তু একটা জিনিষ বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এত বড় একটা কাজে শাজাদা হুসেন নিজে না এসে, তাঁর একটা রিক্‌শাওয়ালাকে পাঠালেন কেন? হাঁ, ঐ যে সিন্ধুক ত খোলাই রয়েছে। আমাদের এখানে আসবার আগেই এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে!"

দাশুবাবু সিন্ধুকের সামনে এসে দেখলেন সেটা খোলা এবং ভেতরের সব-কিছুই সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

শঙ্কর কি একটু ভেবে লাশ দুটির গায়ে নিজের হাত ছোঁয়াল। খানিকক্ষণ তাদের পরীক্ষা করে বলল, "দেখুন দাশুবাবু! এঁদের দু'জনের মধ্যে জমিদার অমরবাবুর মৃত্যু হয়েছে আগে; কারণ, তাঁর দেহ এখন ঠাণ্ডা—বরফের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু এই রিক্‌শাওয়ালার মৃত্যু হয়েছে মাত্র অল্পক্ষণ আগে। কাজেই এর দেহটা রয়েছে এখনো গরম।

মৃত্যুর কোন চিহ্নই এদের দেহে নেই মনে হচ্ছে। দু'জনকে একই অজ্ঞাত কারণে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।"

দাশুবাবু ঘরের চারদিকে তাকালেন। কিন্তু কোথাও এমন কিছুই চোখে পড়ল না—যাতে এই রহস্যের কোনো কিনারা হতে পারে।

শঙ্করের সতর্ক চক্ষুদুটিও চারদিকে ঘোরাফেরা করছিল। ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছানো ছিল। সেই কার্পেটের ওপর

ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোতে কিছু চিক্‌চিক্ করতেই শঙ্কর নীচু হয়ে সেটা সাবধানে তুলে নিয়ে দেখল, এক টুকরো খুব পাতলা কাঁচ! একটু চেষ্টা করতেই সেই রকম আরও কতকগুলো কাঁচের টুকরো সংগ্রহ হল। শঙ্কর সেগুলোকে যত্ন করে একটা কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল।

শঙ্কর বলল, "এই রিক্‌শাওয়ালা ছাড়া এখানে আরো কেউ এসে উপস্থিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। সে-ই কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে অমরবাবুকে হত্যা করে সিন্ধুক খুলে ভেতরের মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে উধাও হয়েছে। একমাত্র 'পোষ্ট-মর্টেম' (Post-mortem) পরীক্ষা ছাড়া এই মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করাও অসাধ্য। সম্ভবতঃ, এই রিক্‌শাওয়ালার মৃত্যুর জন্যও দায়ী সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি।

জমিদার অমর চৌধুরীর মৃত্যুর কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। তাঁকে খুন করা হয়েছে ময়ূরকণ্ঠী হারের লোভে। কিন্তু এই রিক্‌শাওয়ালাকে হত্যা করা হল কেন? বিশেষতঃ, সে-ও যে শাজাদা হুসেনেরই দলের লোক!"

শঙ্কর শত চিন্তা করেও কোন কারণ ঠিক করতে পারলে না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, "জমিদার অমর চৌধুরী ও এই রিক্‌শাওয়ালা, দু'জনেই বিরুদ্ধদলের লোক। অথচ তাদের মৃত্যু হল প্রায় একই সময়ে; মৃত্যুর উপায়ও সম্ভবতঃ একই। কিন্তু কি এর কারণ হতে পারে?"

চার

বিষাক্ত বাষ্প

সকালে উঠে শঙ্করকে কোথাও দেখতে না পেয়ে অসীম সোজা তার ল্যাবরেটরীতে এসে হাজির হল।

শঙ্কর তখন এক মনে কতকগুলো কাচের টেষ্ট্-টিউব নিয়ে সাবধানে নাড়াচাড়া করছিল। অসীমকে ঘরে ঢুকতে দেখে একবার তার দিকে মুখ তুলে তাকাল মাত্র। তারপর আবার গম্ভীর ভাবে নিজের কাজে মন দিল।

অসীম রহস্যভরে জিজ্ঞাসা করল, "এত সকালেই গভীর ভাবে বিজ্ঞান-চর্চ্চার কি এমন কারণ ঘটল আবার ?"

শঙ্কর একটা কাঁচের টুকরো গভীর ভাবে পরীক্ষা করতে-করতে বলল, "যথেষ্ট কারণ ঘটেছে অসীম! তুমি হয়ত শুনলে আঁৎকে উঠবে যে এই কাঁচের সামান্য টেষ্ট্-টিউবটার ভেতরেই জমিদার অমর চৌধুরী এবং রিক্‌শাওয়ালার মৃত্যু-রহস্য লুকিয়ে আছে। এখন যেমন করে হোক, আমাকে সেই অজ্ঞাত রহস্য সমাধান করতে হবে।"

পাঁচ মিনিট পর শঙ্কর আতঙ্ক-মিশ্রিত স্বরে বলে উঠল, "কি আশ্চর্য্য!"

অসীম শঙ্করের কথা শুনে তার কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, "আশ্চর্য্য কি শঙ্কর ?"

শঙ্কর টেষ্ট্-টিউবটা সাবধানে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে

অসীমের দিকে তাকাল। অসীম দেখতে পেল, তার চোখদুটো উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

শঙ্কর বলল, "অমর চৌধুরী এবং রিক্‌শাওয়ালার মৃত্যুর কারণ আর্সেনিক-মিশ্রিত একটা ভয়ানক বিষাক্ত বাষ্প। সেই বিষাক্ত বাষ্প নিঃশ্বাসের সাথে তাদের ফুসফুসে যাওয়া মাত্র তাদের মৃত্যু ঘটেছে। তাই তাদের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি—অক্ষত অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে।"

অসীম জিজ্ঞাসা করল, "আর্সেনিক-মিশ্রিত বিষাক্ত বাষ্প এত জিনিষ থাকতে শেষে—"

শঙ্কর একটা কিছু চিন্তা করছিল। সে মাথা দুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ! এইটেই হত্যাকারীর বিশেষত্ব। হত্যাকারী যে-ই হোক, সে একজন অতি নিপুণ বিষাক্ত বাষ্প-বিশারদ। অন্ততঃ এটা সত্য যে বিষাক্ত বাষ্প সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান আছে। আমি অমরবাবুর ঘরের কার্পেটের ওপর থেকে যে পাতলা কাঁচের টুকরোগুলো সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলো ঐ বিষাক্ত বাষ্পের পাতলা কাঁচপাত্রের কতকগুলো ধ্বংসাবশেষ মাত্র।"

অসীম অবাক্ হয়ে শঙ্করের কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "হত্যাকারী ঐ বিষাক্ত বাষ্প তাদের ওপর প্রয়োগ করল কোন্ উপায়ে?"

শঙ্কর মৃদু হেসে বলল, "অতি সাধারণ এবং অব্যর্থ উপায়ে। কোনো উপায়ে সে ঘরের জানলা দিয়ে সেই বিষাক্ত বাষ্পপূর্ণ পাতলা কাঁচের আধারটা ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

ঘরে পড়েই সেই পাতলা কাঁচের আবরণটা টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, আর ভেতরের বাষ্প তখন সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অমরবাবু ঘরের ভেতরে ছিলেন বটে কিন্তু আত্মরক্ষা করবার অবসর পাননি। সেই বিষ-বাষ্প নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে যাওয়া মাত্র তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

এমনি সময়ে সশব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। শঙ্কর উঠে গিয়ে রিসিভারটা কানের কাছে তুলতেই ইন্‌স্পেক্টর দাশুবাবুর উত্তেজিত স্বর তার কানে এলো, "হ্যালো—হ্যালো, কে শঙ্কর? হ্যাঁ—তোমাকেই আমি ডাকছি। একটা মারাত্মক খবর শুনবার জন্যে প্রস্তুত থাক। 'পোস্ট-মর্টেম' পরীক্ষায় কি প্রকাশ পেয়েছে জান?"

শঙ্কর শান্ত স্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ জানি।"

ওদিক থেকে দাশুবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন, "ছাই জান তুমি। শোন, অমর চৌধুরী এবং রিক্‌শাওয়ালার ফুসফুসের ভেতরে······"

শঙ্কর বাকীটা পূরণ করে দিয়ে বলল, "আর্সেনিক পাওয়া গেছে, এই ত? সে কথা আমি আপনার আগেই জানতে পেরেছি দাশুবাবু!"

দাশুবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কি সর্ব্বনাশ! এ খবর তুমি আবিষ্কার করলে কোত্থেকে?"

শঙ্কর বলল, "সে কথা টেলিফোনে আলোচনা করব না। আপনার সাথে আরো কিছু জরুরী কথা আছে। আপনি এখুনি আমার এখানে চলে আসুন দয়া করে।"

পাঁচ

রহস্যের সন্ধানে

আধঘণ্টার ভেতরেই দাশুবাবু ব্যস্তভাবে শঙ্করের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন।

তাঁকে দেখে শঙ্কর বলল, "এতটা পথ এসে আপনার দেহ যে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে দেখছি দাশুবাবু! যাই হোক, তার জন্যে কোনও চিন্তা নেই। তার উপযুক্ত ওষুধও আমার কাছে আছে। আগে তার সদ্ব্যবহার করুন, তারপর অন্য কথা।"

প্রায় ডজনখানেক টোস্ট আর ডিম ধ্বংস করে দাশুবাবু চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন। তারপর চুমুক দিতে-দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই আর্সেনিকের খবর তুমি কোত্থেকে পেলে শঙ্কর? কে তোমাকে আমার আগেই এই সংবাদ দিলে?"

শঙ্কর বলল, "সামান্য কতকগুলো কাঁচের টুকরো। অমরবাবুর ঘরের মেজেতে বিছান কার্পেটের ওপর কতকগুলো পাতলা কাঁচের টুকরো দেখতে পেয়ে সেগুলো আমি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। আজ সকালে আমার ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম, সেই কাঁচের টুকরোগুলোর গায়ে লেগে আছে আর্সেনিক-মিশ্রিত কিছু তরল পদার্থ। তাই

থেকেই জানতে পেরেছি যে, এই মৃত্যুর একমাত্র কারণ আর্সেনিক-মিশ্রিত কোনও বিষাক্ত বাষ্প।"

দাশুবাবু বললেন, "বলিহারি তোমার বুদ্ধি শঙ্কর! কে এই বিষাক্ত বাষ্প পরিবেষণ করেছেন, তা জানতে পেরেছ?"

শঙ্কর বলল, "না। সে কথা কাঁচের টুকরোগুলো আমায় বলেনি। তবে তাদের যতটুকু ক্ষমতা আমায় সাহায্য করেছে। এখন তাদের দেওয়া এই সূত্র ধরেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এটুকু জেনে রাখুন যে, এই হত্যার পেছনে আছে কোনও নিপুণ 'কেমিষ্ট',—মানে, বিষাক্ত বাষ্প-সম্বন্ধে যার জ্ঞান অসাধারণ।"

দাশুবাবু বললেন, "এবং সে তার আবিষ্কৃত এই অদ্ভুত মারণাস্ত্রের সাহায্যে দুজন লোকের ভব-যন্ত্রণা দূর করে দিয়ে ঐ ময়ূরকণ্ঠী নেকলেসখানা নিয়ে সসম্মানে প্রস্থান করেছে, এই ত?"

শঙ্কর বলল, "তাছাড়া আর কি হতে পারে বলুন?"

দাশুবাবু হঠাৎ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই বিষাক্ত বাষ্প-প্রয়োগকারী বলে সন্দেহ হয় তোমার?"

শঙ্কর বলল, "এখন আপনার এই কথার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। সেই ভদ্রলোকটিকে এখন আমাদের চেষ্টা করে খুঁজে বের করতে হবে।"

দাশুবাবু বললেন, "কিন্তু তাও যে একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল শঙ্কর! আমাদের পুঁজির মধ্যে তো কেবল ছিল একটা

ঠিকানা,—৪৩নং মলঙ্গা লেন। কিন্তু সে ঠিকানায় তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান করেও কোন সূত্র পাওয়া গেল না। বাড়ীখানায় সম্প্রতি 'To let'এর বিজ্ঞাপন ঝুল্‌ছে।"

শঙ্কর গম্ভীরভাবে কি একটু ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা বাড়ীর মালিকের কাছে কোন খোঁজ নিয়েছিলেন?"

—"হাঁ, নিয়েছি বৈকি! বাড়ীর মালিক মিঃ ডব্লিউ. সি. রায় বললেন, ফয়জাবাদের জমিদার ন্যাথান্ রাও পরিচয় দিয়ে এক ভদ্রলোক তাঁর কাছ থেকে বাড়ী ভাড়া নেন। মাত্র দু'মাস যাবৎ তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন। কাল এসে তিনি বাড়ী ছেড়ে দিলেন বলে জানিয়ে গেছেন।

বাড়ীওয়ালার কোন পাওনা ছিল না, তাই তিনি আর বেশী-কিছু খোঁজ-খবর করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কাজেই দেখ্‌ছ ত শঙ্কর, ব্যাপারখানা এখন বেশ জটিল হয়ে উঠেছে!"

শঙ্কর একমনে চুপ করে কিছু ভাবছিল। দাশুবাবুর কথা শেষ হতে সে জিজ্ঞাসা করল, "অমর চৌধুরীর জমিদারী বিলাসপুর এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন দাশুবাবু?"

দাশুবাবু উত্তর দিলেন, "তা প্রায় মাইল তিরিশেক হবে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "আর এই অমর চৌধুরীর সম্বন্ধে কিছু জানেন? ভদ্রলোক এখানেই থাকতেন, না বিলাসপুর থেকেই এখানে এসেছিলেন কোনো কাজে?"

দাশুবাবু বললেন, "যতদূর জেনেছি, তাতে দেখা যায় যে,

তিনি তাঁর জমিদারী বিলাসপুরেই থাকতেন। তবে মাঝে-মাঝে এখানে বেড়াতে আসতেন বটে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "অমরবাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আর কে কে আছেন?"

দাশুবাবু বললেন, "একমাত্র ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ নেই।"

শঙ্কর উৎসুকভাবে বলল, "তাঁর ভাই এখন কোথায় আছে কিছু জানেন?"

দাশুবাবু বললেন, "শুনেছি সে বোম্বাইয়ে খুব বড় একটা কি ব্যবসা করে এবং সেখানেই থাকে। তবে মাঝে-মাঝে সে অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসত বটে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, "আর কিছু?"

দাশুবাবু বিরক্তির স্বরে বললেন, "না। আর বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি। তবে অমরবাবুর বহুমূল্যবান পুরোনো জিনিষপত্র সংগ্রহ করার একটা বাতিক ছিল। সেইজন্যেই বোধহয় জেদের বশে ময়ূরকণ্ঠী নেকলেসটার জন্যে জলের মত এতগুলো টাকা খরচ করেছিলেন।"

দাশুবাবুর কথা শেষ হলে শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে কি চিন্তা করল! তারপর বলল, "আমি আজ বিলাসপুর রওনা হচ্ছি বিনোদবাবু! সেখানে এই অদ্ভুত রহস্যের কোনো সূত্র পাওয়া যেতেও পারে।"

দাশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি একলাই যাবে সেখানে?"

শঙ্কর মৃদু হেসে বলল, "হ্যাঁ। আপাততঃ আমি একলাই বিলাসপুর রওনা হব। পরে দরকার হলে অসীম এবং আপনাকেও দলে টানব। এখন একলাই আগে কাজ আরম্ভ করা দরকার; তাতে যথেষ্ট সুবিধাও হবে।"

দাশুবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ধন্যবাদ! তোমার ওপর এই কাজের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকব। আমার হাতে এখন একটা গুরুতর কাজ রয়েছে, নইলে তোমার সাথে যেতাম। তবে দরকার হলে আমায় জানিও। আমি সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।"

অসীম হাসতে-হাসতে বলল, "গুরুতর কাজের চাপেই আপনার শরীরটা এত শুকিয়ে গেছে বোধহয়? তা এবারকার গুরুতর কাজটা কি শুনতে পারি?"

দাশুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "একটা সুশিক্ষিত এবং সুসংবদ্ধ দল বহুদিন যাবৎ বেআইনি ভাবে আফিম চালানের ব্যবসা করছে। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও আজ পর্য্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, সন্ধান পর্য্যন্ত পায়নি। পুলিশকে কলা দেখিয়ে দিব্যি নির্ব্বিবাদে তারা নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের ছুটোছুটি করে বেড়ানোই সার—আজ অবধি তাদের কোনো সন্ধানই পাইনি।

পুলিশের এই অপূর্ব্ব কেরামতিতে পুলিশ-কমিশনার হুকুম দিয়েছেন যে, একমাসের মধ্যে এই বেআইনি আফিম-ব্যবসায়ীর দলকে নির্ম্মূল করতে না পারলে, তিনি যাদের হাতে

এই তদন্তভার আছে, তাদের সস্‌পেণ্ড করবেন। সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে, তদন্তকারী অফিসারের মধ্যে আমিও একজন। সুতরাং আমার কাজ এবং ভবিষ্যৎ বিপদের গুরুত্ব বুঝতেই পারছ শঙ্কর !"

শঙ্কর দাশুবাবুর বক্তব্যের ভঙ্গি দেখে হেসে বলল, "মাভৈঃ ! চেষ্টা করুন। চেষ্টার অসাধ্য কাজ এই পৃথিবীতে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এখানে একটা কথা আপনাকে বলে রাখা দরকার। অমরবাবুর মৃত্যু-সংবাদ এবং আমার বিলাসপুরে রওনা হবার কথা একান্ত গোপন রাখবেন। বাইরে এসব কথা যেন কোনো রকমে কিছুদিন প্রকাশ না হয়।"

দাশুবাবু হাত তুলে অভয় দিয়ে বললেন, "তথাস্তু !"

ছয়

বিলাসপুরে

বিলাসপুর পৌঁছে শঙ্কর যখন ট্রেণ থেকে নামল, তখন রাত্রি দশটা। অনেক ঘোরাঘুরির পর ষ্টেশন-মাষ্টারকে আবিষ্কার করে সে একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

ষ্টেশন-মাষ্টার তার হাতের আলোটা তুলে শঙ্করের মুখ দর্শন করে ভারিক্কি চালে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাই আপনার ?"

শঙ্কর প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে তার মুখটা ভাল করে দেখে নিয়ে মনে-মনে বলল, "বিলাসপুরের এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনেও ইন্স্পেক্টর দাশুবাবুর জুড়িদার আছে দেখছি! মুখ নিরীক্ষণ না করে কিছু বুঝবার উপায় নেই যে কথা কইছে কে! ষ্টেশন-মাষ্টার, না স্বয়ং পুলিশ-কমিশনার !"

তারপর নিতান্ত বিনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনিই এখানকার স্টেশন-মাষ্টার ?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর এলো, "হ্যাঁ ! কি চাই ?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "আজ্ঞে, চাই না কিছুই। আমি একটা সংবাদ জানতে এসেছি মাত্র। শুনেছি বিলাসপুরের জমিদার অমর চৌধুরী খুব সদাশয় ব্যক্তি। আমি অনেকদূর থেকে তাঁর কাছে ছুটে এসেছি একটা চাকরীর আশায়।"

ষ্টেশন-মাষ্টার উত্তর দিলেন, "ফুঃ! এত জায়গা থাকতে চাকরীর সন্ধানে এই বিলাসপুর! কিন্তু জমিদার অমর চৌধুরী এখন এখানে নেই। তবে তাঁর এক গোঁয়ার-গোবিন্দ ভাই এখানে আছে এখন। চেষ্টা করে দেখতে পারেন। অদৃষ্ট ভাল হলে একটা কিছু জুটে যেতেও পারে।"

শঙ্কর আর কোনও প্রশ্ন না করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ষ্টেশন ছেড়ে পথে এসে নামল। খানিকটা দূরে একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখতে পেয়ে সহিসকে জমিদার-বাড়ী যেতে বলে শঙ্কর তাতে উঠে বসল।

পরিষ্কার আকাশে এক ফালি চাঁদ যথাসম্ভব পৃথিবীকে আলো দান করবার চেষ্টা করছিল। পথের দুধারে বড়-বড় গাছ ডালপালা বিস্তার করে নিঝুম ভাবে ঘুমুচ্ছে। শঙ্কর বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে বসে ভাবছিল: "ষ্টেশন-মাষ্টার বললেন যে অমরবাবুর ভাই এখন এখানে আছে। অথচ দাশুবাবুর কাছ থেকে সে শুনেছিল যে, সে নাকি বোম্বাইয়ে থেকে কিসের ব্যবসা করে! সে হঠাৎ এই বিলাসপুরে এলো কেন?"

প্রায় পনেরো মিনিট পর গাড়োয়ানের ডাকে শঙ্করের চমক ভাঙল। গাড়োয়ানের দিকে তাকাতে সে বলল, "জমিদার-বাবুর বাড়ী সামনেই এসে গেছে বাবু! আপনি এখানেই নামবেন?"

শঙ্কর বলল, "এত রাতে আর কাউকে বিরক্ত করে কাজ

নেই। আজকের রাতটা অন্য কোথাও কাটাতে হবে। এখানে সামনেই কোথাও ভাল হোটেল অথবা থাকবার জায়গা আছে বলতে পার ?"

গাড়োয়ান তাকে কিছু দূরেই একটা হোটেলে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। শঙ্কর তার জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে হোটেলওয়ালাকে ডেকে পাঠাল।

সে আসতেই বিরক্তির স্বরে বলল, "শুনেছিলাম বিলাসপুর অতি উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে এলে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে, এমনি এর জলবায়ুর গুণ। এখন দেখছি, সে সব বিলকুল বাজে!"

হোটেলওয়ালা বলল, "আজ্ঞে এখানে এলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে কিনা জানি না। তবে একথা ঠিক যে, এখানে একটা ইঁদুর এসে বাস করলেও একমাসেই সে হাতি হয়ে উঠবে, এবং তার প্রমাণ আমি এই হোটেলেই দেখেছি।"

হোটেলওয়ালার জবাব শুনে শঙ্কর তার হাসি চেপে রেখে বিস্মিতভাবে বলল, "তাই নাকি! আজ প্রায় বছরখানেক ভুগে-ভুগে আমার শরীর শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে! এখানে থাকলে উপকার পাব নিশ্চয়ই ?"

হোটেলওয়ালা শঙ্করের পেশী-বহুল মাংসল দেহের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিলক্ষণ! আপনার ঐ রোগা শরীর এক মাসেই হাতি হয়ে উঠবে দেখবেন।"

শঙ্কর খুসী হয়ে বলল, "তাহলে এখানেই একমাস না হয়

থেকে দেখা যাক। তবে এখানকার সব-কিছুই নূতন। সুতরাং কয়েকটা খোঁজ আগে থেকেই জেনে রাখা দরকার।”

তারপর মনে-মনে কিছু গুছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “এখানকার জমিদার অমরবাবু এখন এখানে নেই শুনলাম। তিনি কোথায় গেছেন বলতে পার ?”

হোটেলওয়ালা উত্তর দিল, “তা বলতে পারি না। তিনি প্রায়ই বাইরে বেড়াতে যান। তাঁর আমলে অতি সুখে আছি আমরা। কিন্তু আজ মাসখানেক হল তাঁর ছোট ভাই ভুজঙ্গ চৌধুরী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অমরবাবু যেমন অতি শান্ত উদার-প্রকৃতির ভদ্রলোক—তাঁর ভাইটি ঠিক তার উল্টো। দু'জনে আপন ভাই বলে বাইরে থেকে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।”

শঙ্কর উৎসুক-ভরে জিজ্ঞাসা করল, “বটে! তা ভুজঙ্গবাবু হঠাৎ বিদেশ থেকে এখানে এসে হাজির হলেন কেন ?”

হোটেলওয়ালা উত্তর দিল, “ভগবান্ জানেন!”

শঙ্কর বুঝল যে অমরবাবুর এই ভাইটির ওপর এখানে কেউ তেমন সন্তুষ্ট নয় বোধহয়,—এবং অমরবাবুর মৃত্যুর খবর এখনও এখানে এসে পৌঁছয়নি।”

শঙ্কর বলল, “আমি এখানে নূতন এসেছি; সুতরাং জমিদারের সাথেও একটু খাতির রাখা দরকার। অমরবাবু যখন এখানে নেই তখন তাঁর ভাইয়ের সাথেই না হয় একটু আলাপ করে আসব। কখন গেলে তাঁর সাথে দেখা হবে ?”

হোটেলওয়ালা বলল, "তা বলা মুস্কিল। তবে ভদ্রলোককে বাড়ী থেকে বাইরে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শুধু একদিন গঙ্গার ধারে তাঁকে আমি দেখেছিলাম—আর কখনো দেখা পাইনি।"

রাত্রে হোটেলে শুয়ে-শুয়ে শঙ্কর ভাবতে লাগলঃ "অমরবাবুর ভাইয়ের এখানে আসার সাথে অমরবাবুর মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই ত?"

সাত

ভুজঙ্গের গুণ্ডামি

সকালে উঠে চা খেয়ে শঙ্কর হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা জমিদার-বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রায় বিঘাখানেক জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ-তুল্য বাড়ী। বাড়ীর সামনে চারদিকে ছোট-বড় নানাজাতীয় সৌখীন গাছ! দেখেই বোঝা যায়, বাড়ীর মালিকের রুচিজ্ঞান আছে যথেষ্টই।

সদর দরজায় এসে কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একজন চাকর বেরিয়ে এলো। তাকে জিজ্ঞেস্ করে জানা গেল যে, ভুজঙ্গবাবু বাড়ীতেই আছেন।

শঙ্কর চাকরটাকে বলল, "তোমার বাবুকে বল যে এক ভদ্রলোক খুব জরুরী দরকারে তাঁর সাথে একবার দেখা করতে চান।"

খানিকক্ষণ পর চাকরটি ফিরে এসে দোতালায় একটা প্রকাণ্ড ড্রয়িং-রুমে শঙ্করকে এনে, বসতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটা কৌচে বসে শঙ্কর চারদিকে তাকাল। চারদিকের দেয়ালে অনেকগুলো বড়-বড় বিলাতী ছবি। মেজেতে মূল্যবান

একখানি কার্পেট পাতা। আরো অনেক সৌখীন মূল্যবান জিনিষে ঘরখানা নিখুঁতভাবে সাজান।

ঘরের পেছনে একটা বারান্দা দেখতে পেয়ে শঙ্কর কৌচ থেকে উঠে বারান্দায় এলো। বাড়ীটার পেছনেই একটা প্রকাণ্ড বাগান,—বড়-বড় গাছপালায় ভর্ত্তি। বাঁ-দিকেই কিছু-দূরে গঙ্গা।

বারান্দা থেকে বেরিয়ে এসে শঙ্কর আবার বসতে যাবে, এমন সময় কারো পায়ের শব্দে সে দরজার দিকে তাকাল। পর-মুহূর্ত্তেই একজন লোক এসে সেই ঘরে প্রবেশ করল।

ভদ্রলোকের বয়স প্রায় বছর ত্রিশেক হবে। যথেষ্ট শক্তিশালী চেহারা এবং চোখে বাজপাখীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চোখের দৃষ্টি কঠিন হলেও তাতে ফুটে উঠেছে একটা আতঙ্ক এবং সন্দেহের ছাপ।

শঙ্করের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে থেকে সে প্রশ্ন করল, "কি চাই?"

শঙ্কর হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "আপনিই অমরবাবুর ভাই ভুজঙ্গ চৌধুরী?"

কর্কশস্বরে উত্তর এলো, "হ্যাঁ! এ অধমের পরিচয় আপনার জানা আছে দেখছি! কিন্তু মশায়কে ত কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না! আমার সাথে এমন কি জরুরী দরকার?"

লোকটার এই অভদ্র ব্যবহারে শঙ্কর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হলেও হেসে বলল, "না! এর আগে আপনার সাথে পরিচিত

হবার সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটেনি। আমি এখানে নূতন এসেছি।"

বিদ্রূপের স্বরে ভুজঙ্গ বলল, "হাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু আপনার সেই আগমনটা হল কেন বলতে পারেন? কি এমন জরুরী প্রয়োজন, যার জন্য এই অধীনকে তলব করা হয়েছে?"

লোকটির ব্যবহারে শঙ্কর ক্রমশঃই বিরক্ত ও বিস্মিত বোধ করছিল। সে বুঝতে পারল যে, ভুজঙ্গ সাধারণ ধরণের মানুষ নয় মোটেই। কাজেই তাকে অতি সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। কোনো রকমে তার আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলে সব বৃথা হবে। অমরবাবুর সম্বন্ধে কোন সন্ধানই সে পাবে না।

সে গম্ভীরভাবে বলল, "একটা দুঃসংবাদ শুনবার জন্যে তৈরী হন ভুজঙ্গবাবু! আপনার দাদা মারা গেছেন শুনেছেন?"

শঙ্করের কথা শুনে ভুজঙ্গের মুখ মুহূর্ত্তের জন্যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল! পরক্ষণেই সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা মারা গেছেন? তা এই খবর আপনি পেলেন কি করে?"

শঙ্কর বলল, "অমরবাবুর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল। তাই এই খবর দেবার জন্যে আমি এসেছি।"

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করল, "বেশ! আর আমি এখানে আছি এই সংবাদ আপনি যোগাড় করলেন কোথেকে?"

শঙ্কর মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করে বলল, "সে কথা আমি অমর-বাবুর মুখ থেকেই শুনেছি।"

শঙ্করের এই কথার উত্তরে ভুজঙ্গ হো-হো করে ভয়ানক ভাবে হেসে বলল, "দাদার মুখ থেকে শুনেছ ! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আমার চোখে ধূলো দেবে ভেবেছ ?"

কথা বলতে-বলতে ভুজঙ্গের চেহারা ভয়ানক ভাব ধারণ করল। সে গর্জ্জন করে বলল, "হতভাগা ছুঁচো কোথাকার ! আমার সাথে তুমি শয়তানি করতে এসেছ ? কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি বড় সাংঘাতিক জায়গায় এসে পড়েছ ! আজ আর তোমার নিস্তার নেই। ভণ্ড কাপুরুষ কোথাকার ! আমার ওপর বাটপাড়ি করবার স্পর্দ্ধা রাখ তুমি ! সত্যি করে বল তুমি কে ? এখানে কে তোমাকে পাঠিয়েছে ?"

কথা বলতে-বলতে ভুজঙ্গ ঘুসি বাগিয়ে শঙ্করের দিকে অগ্রসর হল। ভুজঙ্গের অদ্ভুত কথাবার্ত্তা এবং তার এই বিচিত্র ব্যবহার তাকে দস্তুরমত বিস্মিত করল। কিন্তু তখন আর সে কথা নিয়ে চিন্তা করার অবসর ছিল না। এই অভদ্র গুণ্ডাটার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সে তৈরী হয়ে হেসে বলল, "আপনাকে অনুরোধ করছি ভুজঙ্গবাবু যে দয়া করে আমাকে নেহাৎ শিশু মনে করবেন না। আমাকে এইভাবে অপমান করবার উদ্দেশ্য আমার চেয়ে আপনার বেশী জানা আছে। কিন্তু আর যাই করুন, আমাকে স্পর্শ করবার স্পর্দ্ধা আপনার না হলেই মঙ্গল।"

শঙ্করের কথা শেষ হতে না হতেই ভুজঙ্গ একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

শঙ্কর এতটা আশা করেনি। সে একটু পাশ কাটিয়ে ভুজঙ্গের আক্রমণ এড়িয়ে তার চোয়ালে একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারল। সেই প্রচণ্ড ঘুসির বেগ সামলাতে না পেরে ভুজঙ্গ একধারে ছিটকে পড়তেই, শঙ্কর আর কোনো কেলেঙ্কারী হবার আগেই—সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সদর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভুজঙ্গের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে শঙ্করের মনে একটা খটকা লাগল। তার প্রতি ভুজঙ্গের এই অভদ্র ব্যবহারের কারণ কি? তার এই অভদ্র গুণ্ডামির পেছনে কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা কি?

আট
গুপ্ত ল্যাবরেটরী

ভুজঙ্গবাবুর সাথে দেখা করে কোনও ফল না হওয়ায় শঙ্কর একটা মারাত্মক সঙ্কল্প করে রাত্রের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

রাত প্রায় একটার সময় শঙ্কর অতি সন্তর্পণে তার হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। আকাশে তখন অল্প-অল্প মেঘ। তারই আব্ছা-অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে অমরবাবুর বাড়ীর পেছনের বাগানে এসে দাঁড়াল।

বাড়ীটাকে সে আগেই লক্ষ্য করে দেখেছিল। তার ধারণা হল যে, সবার অজ্ঞাতে সেই বাগান দিয়ে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করতে তাকে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না।

সে চুপি-চুপি বাগানে প্রবেশ করল। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। বিশালাকার দৈত্যের মত কালো-কালো প্রকাণ্ড গাছগুলো নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও একটা পাতার শব্দ পর্য্যন্ত শোনা গেল না।

গাছের আড়ালে-আড়ালে সে বাড়ীটার কাছে এগিয়ে এলো। ভেতরে ঢুকবার রাস্তা খুঁজতে-খুঁজতে সে একটা ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তার বেশ মনে পড়ল যে, সেই ঘরটার ডান ধারেই রয়েছে বাড়ীর দরজা—কাল যেটা দিয়ে সে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

ভুজঙ্গ একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে লাফিয়ে পড়ল। [পৃঃ—৪৬

খানিকক্ষণ চেষ্টা করে শঙ্কর সেই ঘরের একটা জানলা খুলে ফেলল। চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই সে জানলা টপকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল।

ভেতরে ঢুকেই সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনদিকে কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের টর্চ্চটা জ্বালল।

টর্চ্চের উজ্জ্বল আলোতে দেখা গেল ঘরখানা শূন্য। কোনও লোক ত দূরের কথা, সামান্য একটা আসবাবপত্রও সেখানে নেই!

তার ঠিক সামনের দিকেই একটা দরজা দেখতে পেয়ে শঙ্কর সেদিকে এগিয়ে গেল। তারপর অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল।

শঙ্করের ধারণা হয়েছিল যে, সেই ঘরটার পাশেই রয়েছে ওপরে উঠবার সিঁড়ি। কালকে এসে বাড়ীটার সম্বন্ধে সেই রকমই একটা ধারণা হয়েছিল তার মনে। কিন্তু দরজা খুলে পাশের ঘরে ঢুকে হাতের টর্চ্চটা জ্বালাতেই সে অতিমাত্র বিস্মিত হল!

ঘরটা চারদিকেই কাচের বড়-বড় আলমারীতে ভরা। তার ডান দিকেই একটা প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর কাচের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজান। একটা আলমারী কেবল মোটা-মোটা বইয়ে ভরা—বাকীগুলো নানা রংএর—নানাজাতীয় ওষুধ-ভরা কাচের বোতল আর শিশিতে পরিপূর্ণ।

ঘরের সেই অবস্থা দেখে যে কেউ বলে দিতে পারে, সেটা

নানাজাতীয় ওষুধ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিপূর্ণ একটা অতি আধুনিক ল্যাবরেটরী মাত্র। সিঁড়ি খুঁজতে গিয়ে ভুলক্রমে সে বাড়ীর ভেতরেই একটা ল্যাবরেটরীতে এসে পড়েছে।

শঙ্কর যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! এই আকস্মিক আবিষ্কারে সে মনে-মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিল।

তার মনের ভেতরে তখন একসঙ্গে কতকগুলো প্রশ্নের উদয় হল। এই ল্যাবরেটরীটা কার? অমরবাবুর, না ভুজঙ্গের? দুজনের মধ্যে একজন যে বিচক্ষণ কেমিষ্ট, তাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এই ল্যাবরেটরীই তার প্রমাণ। অমরবাবুর হত্যাকারী যে একজন বিচক্ষণ কেমিষ্ট, তা সে আগেই জানতে পেরেছিল। এখন এই ল্যাবরেটরী আবিষ্কার করে তার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হল। কে বলতে পারে যে অমরবাবুর মৃত্যুর কারণ যে বিষাক্ত বাষ্প, তা এখানেই জন্মগ্রহণ করেনি?

কিছু চিন্তা করতে-করতে শঙ্কর বইয়ে ভরা আলমারীটার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর সেটা থেকে একখানা বই নিয়ে মলাটটা ওল্টাতেই দেখা গেল, তাতে লেখা রয়েছে, "ভুজঙ্গ চৌধুরী।"

এই ল্যাবরেটরীটা তাহলে ভুজঙ্গবাবুর! এবং তিনি যে একজন সুদক্ষ কেমিষ্ট, তার প্রমাণ তাঁর এই আধুনিক ল্যাবরেটরী। কিন্তু এই অখ্যাত বিলাসপুরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই ল্যাবরেটরী রাখবার উদ্দেশ্য কি? অমরবাবুর মৃত্যু-দূত কি তাহলে এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিল?

নয়

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

পরদিন সকালে উঠেই শঙ্করের সর্ব্বপ্রথম কাজ হল ভুজঙ্গ-বাবুর সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া। তিনি বিদেশে কিসের ব্যবসা করতেন? এখানেই বা এসেছেন কেন? ল্যাবরেটরী তাঁর কিসের জন্য? শঙ্করের মনে হল, এই সব সংবাদের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। অন্ধকারের ভেতরে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে সে যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল!

হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেও কিছু সুবিধে হল না। ভুজঙ্গ চৌধুরীর সম্বন্ধে এখানকার লোক কিছুই জানে না।

ভুজঙ্গের ওপর এখানকার সকলেই খুব অসন্তুষ্ট দেখে সে মনে-মনে হাসল। 'ভুজঙ্গ' নামটি যেই রাখুক না কেন, তার দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। লোকটি যে বড় হয়ে একটি ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের রূপই ধারণ করবে, তা হয়ত নামদাতা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল!

হোটেল থেকে বেরিয়ে শঙ্কর বেড়াতে-বেড়াতে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হল। গঙ্গার গভীরতা এখানে খুব বেশী; চওড়াও নেহাৎ কম নয়। কারণ, গঙ্গা এখান থেকে মাইল-দুয়েক দূরেই সমুদ্রের সাথে গিয়ে মিশেছে।

সূর্য্যের আলো তখন গঙ্গার জলে পড়ে রূপ্যের মত চিক-চিক করে জ্বলছিল। ক্রমে সেই আলোও নিভে এলো—ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। শঙ্কর খানিকক্ষণ সেইখানে গঙ্গার তীরে বসেই নিজের কর্ম্মপন্থা স্থির করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

শঙ্করের মনে হচ্ছিল কত কথা !—

"জলজ্যান্ত একটি সুস্থ লোক—জমিদার অমর চৌধুরী কোন্ দুর্বৃত্তের অভিনব ষড়যন্ত্রের ফলে হঠাৎ একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন ? কে সেই লোক ? আর কি তার মারণ-অস্ত্র ?

শাজাদা হুসেনকে এই ব্যাপারের নায়ক বলে সন্দেহ করা যায় বটে, কিন্তু কি তার প্রমাণ! সেও যে এত বড় কলকাতা সহর থেকে যেন কর্পূরের মত উপে চলে গেছে !

যে রিক্‌শাওয়ালাকে শাজাদার দলভুক্ত বলে মনে হয়েছিল, জমিদার অমর চৌধুরীর সঙ্গে সে লোকটাও খুন হয়ে গেল ! এতে যে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল আরো জটিল ও গোলমেলে ! জমিদার অমর চৌধুরীর সঙ্গে শাজাদার নিজের একটা লোকও খুন হল ; তবে কি খুনী যে, সে শাজাদার দলের কেউ নয় ? তাই যদি হয়, তবে শাজাদাই বা পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন ?

রিক্‌শা-গাড়ীর রহস্যজনক নম্বর সম্বন্ধে খোঁজ করবার ভারটা দিয়ে এসেছি অসীমের ওপর। ১২৩ নম্বর গাড়ী ;

কিন্তু ঘটনার দিন একজন লোক এসে যখন শাজাদাকে জিজ্ঞেস্ করেছিল, এখন কত নম্বর হবে, শাজাদা তখন তাকে বলেছিল, 'এবার তা একদম্ উল্টে দে—করে দে ৩২১ নম্বর।'

শাজাদা যে রিক্শা-গাড়ীর নম্বর সম্বন্ধেই সেকথা বলেছিল, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদিন রিক্শা-গাড়ীর ব্যবহার হয়েছিল কেন? খুনী কি রিক্শা চেপে খুন করতে গিয়েছিল?

শঙ্করের ভাবনার আজ বিরাম ছিল না। সে ভাবতে লাগল,—আচ্ছা, এই ভুজঙ্গ চৌধুরীই বা কেমন লোক? ও লোকটাই বা এমন সন্দিগ্ধ কেন?—

তবে একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি। জমিদার অমর চৌধুরী যে তার ভাইয়ের এখানে আসবার খবর কিছুমাত্র জানতেন না, একথা একেবারে ধ্রুব সত্য। ভুজঙ্গের খবর আমি তার দাদার কাছে শুনেছি, একথা বলায়ই ভুজঙ্গ সেদিন আমাকে ধরে ফেলেছিল। সে জানে যে, অমর চৌধুরী বরাবরই জেনে গেছেন, ভুজঙ্গ বোম্বাইয়ে আছে। সে যে অমরবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগে বিলাসপুরে এসে জেঁকে বসেছে, একথা তিনি একেবারেই জেনে যাননি।

তারপর আর একটা কথা। ভুজঙ্গ এখানে আসতে-আসতেই কি একটা ল্যাবরেটরী গড়ে উঠল? সে কি এত বড় একজন কেমিষ্ট যে, গবেষণা ছাড়া সে একেবারেই থাকতে

পারে না? আর যদি সে কোন কেমিষ্টই হয়ে থাকে, তাহলে এখানে গবেষণা হত কিসের? অমর চৌধুরীর রহস্যজনক মৃত্যুর সাথে এর কোন সংশ্রব আছে কি?

একদিকে শাজাদা হুসেন, আর একদিকে ভুজঙ্গ চৌধুরী, এই দু'জনেই যেন ব্যাপারটাকে জটিল করে ফেলেছে! দু'জনেই যেন কিসের আশঙ্কায় সদা-সন্দিগ্ধ! অথচ, এদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে বার করাও অসম্ভব মনে হচ্ছে!

যাই হোক, আজ আর একবার এই ভুজঙ্গের ও তার ল্যাবরেটরীর পরিচয়টা নিতে হবে।"

শঙ্কর দেখল, সন্ধ্যা পেরিয়ে তখন বেশ রাত হয়ে গেছে—চারদিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গঙ্গার তীরে লোক-চলাচল তখন কমে গেছে, একমাত্র সে-ই তখন পর্য্যন্ত সেই গঙ্গার তীরে চুপচাপ বসে আছে!

সে উঠে দাঁড়াল। তারপর আর হোটেলে ফিরে না গিয়ে ধীরে-ধীরে ভুজঙ্গের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হল।

জমিদারের বিপুল প্রাসাদ তখন অন্ধকারে এক বিরাটাকার দৈত্যের মত দেখাচ্ছিল। শঙ্কর বাড়ীটার চারদিক সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করে দেখল, কেউ কোথাও নেই। বাড়ীর ভেতরেও কারো সাড়াশব্দ কিছু পাওয়া গেল না। ভুজঙ্গ বাড়ীতেই আছে কিনা তাও বাইরে থেকে বোঝা মুস্কিল।

শঙ্কর গোপনে পেছনের বাগানে ঢুকে পড়ল। গাছের

আড়ালে-আড়ালে খানিকটা এগিয়ে সে একটা বড় গাছের গুঁড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। আগের দিন যে জানলাটা দিয়ে সে বাড়ীর ভেতরে ঢুকেছিল, তার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে সে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেও সে কারো দেখা পেল না। কি উপায়ে ভুজঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়, এই তখন তার মনে একমাত্র চিন্তা।

গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে শঙ্কর অপেক্ষা করতে লাগল। সে স্থির জানত যে, বাগানের এই গাছপালার ঘন আবরণ ভেদ করে ভুজঙ্গ তাকে দেখতে পাবে না। এই ভেবে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ তার ঠিক পেছনেই অতি অস্পষ্ট অথচ সতর্ক পদশব্দ শুনে, ফিরে তাকাতেই সে চমকে উঠল। সে দেখ্‌ল, তার ঠিক পেছনেই ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং ভুজঙ্গ চৌধুরী !

শঙ্কর চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই ভুজঙ্গ ফস্‌ করে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে বিদ্রূপের স্বরে বলল, "ঐখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলো শুনলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, লক্ষ্মী ছেলেটির মত সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমার অবাধ্য হলে তোমার মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই দায়ী হব না এই কথাটা দয়া করে মনে রেখো। তোমার অদৃষ্ট ভাল যে, সেদিন

আমার হাত থেকে তুমি উদ্ধার পেয়ে পালাতে পেরেছিলে। তুমি পালাবার পরই আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। তোমার মত একটা মারাত্মক গোয়েন্দার সাথে দেখা করতে হলে সাথে মারাত্মক একটা-কিছু অস্ত্র রাখার একান্ত প্রয়োজন, এবং সেইজন্যে আজ আমি তৈরী হয়েই এসেছি।”

শঙ্কর বলল, “একজন ভদ্রলোককে এইভাবে ভয় দেখাবার কারণ কি, তা আপনিই জানেন। কিন্তু আমায় মেরে আপনি নিজে বাঁচবার আশা রাখেন ?”

ভুজঙ্গ বলল, “সে কথা পরে চিন্তা করব। তোমার প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে যদি আমাকে মরতে হয় তবে তাতে আমি খুব রাজি আছি। ও-সব বাজে কথা এখন থাক। এখন আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কাল রাত্রে তুমিই তাহলে গোপনে আমার ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করেছিলে ?”

শঙ্কর দেখল যে, এখন এই গুণ্ডার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে মিথ্যা কথা বলে কোনও লাভ হবে না। বরং তাতে হিতে বিপরীত হয়ে ভুজঙ্গের মাথায় খুন চেপে বসতেও পারে। তাতে তার মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না।

শঙ্কর এই ভেবে উত্তর দিল, “হ্যাঁ! আমি কাল রাতে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার গোপন ল্যাবরেটরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।”

শঙ্করের কথায় ভুজঙ্গের মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ল।

তারপর সেই ভাব সামলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "উদ্দেশ্য? ল্যাবরেটরীতে বায়ু সেবন করতে গিয়েছিলে বোধ হয়?"

শঙ্কর বলল, "না। ঠিক বায়ু সেবন করতে আপনার ল্যাবরেটরীতে যাইনি একথা ঠিক। তবে ঐ জাতীয়ই একটা কিছু সন্ধানের আশায় গিয়েছিলাম।"

শঙ্করের এই স্পষ্ট উত্তর ভুজঙ্গ হয়ত আশা করেনি। সে গর্জ্জন করে বলল, "হতভাগা! তোমায় আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারতে পারি, জান?"

শঙ্কর অনুনয়ের সুরে উত্তর দিল, "দোহাই ভুজঙ্গবাবু! আমার একান্ত অনুরোধ যে, সেই চেষ্টাও কখনো করবেন না। তবে আপনার মর্জ্জি হলে ফাঁসিকাঠ অবধি আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আপনার হাতের ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি দিয়েই সেই কাজ অতি অপূর্ব্ব ভাবে সমাধা হতে পারে। এখন সর্পরাজের যা অভিরুচি!"

শঙ্করের এই বিদ্রূপে কান না দিয়ে ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ বোস এখন কোথায়?"

ভুজঙ্গের এই অদ্ভুত প্রশ্নে শঙ্কর অবাক হল। সে উত্তর দিল, "মিঃ বোস নামে অন্ততঃ এক হাজার লোকের সাথে আমার পরিচয় আছে স্বীকার করি। কিন্তু আপনার কথিত ঐ মিঃ বোসের সাথে বোধহয় ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হয়নি—পরিচয় থাকা ত দূরের কথা! এবং পরজন্মেও হবে কিনা ভগবান্‌ই জানেন।"

শঙ্করের কথা শুনে ভুজঙ্গ কয়েক সেকেণ্ড কিছু চিন্তা করল। তারপর শান্তস্বরে বলল, "তোমার কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আমি আশা করিনি। এবার আমার একটা কথার উত্তর দাও। তুমি তোমার নিজের প্রাণকে ভালবাস নিশ্চয়ই ?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "বিলক্ষণ! নিজের প্রাণকে ভালবাসব না ত কি আপনার প্রাণকে ভালবাসতে যাব ?"

ভুজঙ্গ জিজ্ঞসা করল, "তাহলে এই সুন্দর পৃথিবীতে অনেকদিন বাঁচবার সাধ রাখ, কেমন ?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই! অনেকদিন বেঁচে থাকা ত দূরের কথা, একেবারে অমর হতে পারলে আরও খুশী হই। কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করবার কারণটা জানতে পারি কি ? আপনি আমায় অমরত্ব প্রদান করবার সঙ্কল্প করেছেন নাকি ? অবশ্য আপনার মত একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মানুষের মৃত্যু ঘটান অথবা অমরত্ব প্রদান করা খুব বেশী কষ্টকর নয়।"

ভুজঙ্গ বলল, "আমার একটা উপকার করলে তার প্রতিদানে আমিও তোমার একটা উপকার করতে রাজি আছি। তোমার প্রাণ এখন আমার হাতে, তা ত বুঝতেই পারছ। আমার অবাধ্য হলে তোমার মৃত্যু ঘটতেও হয়ত বিলম্ব হবে না। কিন্তু এক সর্ত্তে আমি তোমায় জীবন দান করতে রাজি আছি।"

শঙ্কর বলল, "অসীম করুণা আপনার! কিন্তু সর্ত্তটা কি, শুনি।"

ভুজঙ্গ কিছু দৃঢ়স্বরে বলল, "শোন তবে। একটা কথা মনে রেখো। তুমি কে এবং কেন এখানে এসেছ, এ খবর এখন আর আমার জানতে বাকি নাই। তা ছাড়া, আমার দাদা খুন হবার প্রায় সাথে-সাথেই তোমরা যে শাজাদা হুসেনের সেক্রেটারী মিঃ বোসকে গ্রেপ্তার করেছ, সে খবরও আমি পেয়েছি। কিন্তু পুলিশ সম্ভবতঃ সেই ময়ূরকণ্ঠী হারশুদ্ধ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি; ধরা পড়বার আগে সেই দামী জিনিষটা সে যে কোথায় সরিয়ে ফেলেছে, সে খবর আমরাও কেউ জানি না।

তাকে বলবে যে, জিনিষটা ন্যায়তঃ আমারই প্রাপ্য, তা সে জানে। কিন্তু সে তা কোথায় রেখেছে, সঙ্কেতে সে যেন তা তোমার মারফৎ আমায় জানিয়ে দেয়। তাকে জিজ্ঞেস্ করবে,—১, ২, ৩,—এই তিনটি সংখ্যার ভেতর জিনিষটা এখন কোথায়? তুমি যদি প্রতিশ্রুতি দাও যে, এই কথার একটা পরিষ্কার জবাব তুমি আমায় পাঠিয়ে দিবে, তাহলেই তুমি মুক্ত।

আমার কোনো ক্ষতি না করলে, আমি কখনো কারো প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি না। আমি আর যাই হই, বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ নই। শুধু মাত্র এই কথাটার জবাব তুমি আমায় পাঠিয়ে দিও। কথা দিয়ে তুমি যদি তা না রাখ, কিংবা কোনরকম চালাকি করতে চেষ্টা কর, তাহলে

তোমাকে আমি ক্ষমা করব না। এখন তাহলে বুঝেছ আমার কথা ?"

বলা বাহুল্য যে ভুজঙ্গের এই কথাগুলোর মানে শঙ্করের একান্তই দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হল। ভুজঙ্গের অদ্ভুত কথাগুলো সে একবার মনে-মনে আউড়ে নিয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ বুঝেছি বৈকি! এখন তাহলে আমি যেতে পারি, কি বলেন ?"

ভুজঙ্গ গম্ভীরভাবে বলল, "না। আমাকে এতটা নির্ব্বোধ বলে মনে করো না যে তোমাকে আমি অমনি ছেড়ে দেব। তোমার সাথে আমার একজন লোক পাঠাব। তার কাছেই তুমি মিঃ বোসের উত্তর জানাবে। কিন্তু মনে রেখ যে, শয়তানি করলে তুমিও বাঁচবে না বন্ধু !"

শঙ্করের দিক থেকে তার রিভলভারের লক্ষ্য না ফিরিয়েই ভুজঙ্গ বলল, "এইবার তবে বাড়ীর ভেতরে চল।"

শঙ্কর বুঝল যে, এখন অন্ততঃ ভুজঙ্গের দ্বারা তার কোনো অনিষ্ট হবে না। সুতরাং সে বিনা দ্বিধায় বাড়ীর দিকে অগ্রসর হল।

কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হয়েই দুজনে চমকে উঠল। মনে হল, কেউ এতক্ষণ সামনেই কোথাও আত্মগোপন করে চুপি-চুপি তাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। তাদের অগ্রসর হতে দেখেই সে দ্রুতপদে চলে গেল।

ভুজঙ্গ আতঙ্ক এবং সন্দেহ-ভরা দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে

ছিল। হঠাৎ শঙ্কর কোন কথা বলবার আগেই তাদের সামনে হাত-দশেক দূরে একটা কিছু এসে পড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে ঝন্-ঝন্ করে কতকগুলো কাচের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে গেল।

সহসা এমন ভাবে কতকগুলো পাতলা কাঁচের টুকরো দেখতে পেয়ে শঙ্কর আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একলাফে পেছন দিকে খানিকটা দূরে এসে দাঁড়াল। ভুজঙ্গও বুঝি ব্যাপারটা ঠিকই অনুমান করে ফেলেছিল! সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে শঙ্করের পাশে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর দেখল, উত্তেজিত ভুজঙ্গের চেহারা তখন সম্পূর্ণ অন্য রূপ ধারণ করেছে! মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা করেই ভুজঙ্গ দৌড়ে বাড়ীর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দশ

শঙ্করের গবেষণা

শঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল তার সামনেই যে ব্যাপারটা ঘটল তার কারণ কি ? তাদের সামনেই কিছু দূরে যে জিনিষটি পড়ে ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, সেটি যে একটা বিষ-বাষ্প-পূর্ণ কাচের আধার, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এই জাতীয় অস্ত্রের সাহায্যেই অমরবাবু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিলাসপুরে কে তাদের হত্যার সঙ্কল্প করে ঐ একই পন্থা অবলম্বন করল ? অমরবাবুর হত্যাকারী কি তাহলে এই বিলাসপুরেই আত্মগোপন করে রয়েছে ? সে হত্যা করতে চায় কাকে ? ভুজঙ্গকে না শঙ্করকে ?

এসব প্রশ্ন মনে হতেই ভুজঙ্গ সম্বন্ধে একটা কালো পর্দ্দা শঙ্করের চোখের সম্মুখ থেকে ধীরে-ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সে বুঝল যে, অমরবাবুর হত্যাকারী আর যেইই হোক্, ভুজঙ্গ নয়,—ভুজঙ্গ নিজে তাকে হত্যা করেনি। তা ছাড়া, যে মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে অমরবাবুকে হত্যা করা হয়েছে, ঠিক সেই মারণাস্ত্রের সাহায্যেই ভুজঙ্গকেও হত্যা করা অভিপ্রায়। সুতরাং সম্ভবতঃ, এই দুই ক্ষেত্রেই নায়ক হচ্ছে একই ব্যক্তি। কিন্তু কি তার উদ্দেশ্য ?

অমরবাবুকে হত্যার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ময়ূরকণ্ঠী হার। কিন্তু ভুজঙ্গকে হত্যার উদ্দেশ্য কি? ভুজঙ্গ বলেছে, মিঃ বোস জানেন যে, ময়ূরকণ্ঠী হার ন্যায়তঃ ভুজঙ্গেরই প্রাপ্য। তা হলে, যে হত্যাকাণ্ডের ফলে ময়ূরকণ্ঠী হার উপার্জ্জন, তার সাথে ভুজঙ্গেরও যে কোন সংশ্রব নেই, সে কথা কেমন করে বলা যায়? সম্ভবতঃ সংশ্রব আছে, কিন্তু হত্যাকারী সে নিজে নয়। অথচ হত্যাকারী একেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু—কেন?

শঙ্কর ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, তারপর আর এক সমস্যা হচ্ছে, 'মিঃ বোস'! সে শাজাদার সেক্রেটারী—ভুজঙ্গেরও পরিচিত। ময়ূরকণ্ঠী হার সম্পর্কে সম্ভবতঃ দুজনের মাঝে একটা কিছু সর্ত্ত রয়ে গেছে। তারই বলে ভুজঙ্গ দাবী করছে, হারটা 'ন্যায়তঃ' তারই প্রাপ্য।

ভুজঙ্গ খবর পেয়েছে, মিঃ বোস পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু কে তাকে এই খবর দিলে? এই মিথ্যা খবর কি ইচ্ছাকৃত, না অনিচ্ছাকৃত?

ভুজঙ্গ এই আভাসও পেয়েছে যে, মিঃ বোস ময়ূরকণ্ঠী হারশুদ্ধ গ্রেপ্তার হয় নি,—সে তা আগেই কোথায় সরিয়ে ফেলেছে! তবে কি মিঃ বোসই ময়ূরকণ্ঠী হার নিয়ে পালাচ্ছিল? তবে কি সে-ই হত্যাকারী? তাই যদি হয়, সে-ই যদি হত্যাকারী হয়ে থাকে, তবে সে কার হত্যাকারী? অমরবাবুর, না সেই রিকুশাওয়ালার?

হার ছড়ার জন্য অমরবাবুকে হত্যা না হয় বুঝতে পারি। কিন্তু শাজাদারই লোক, রিক্শাওয়ালাকে হত্যার ব্যাপারটা যে খুবই রহস্যপূর্ণ। কে তাকে খুন করলে? এবং কেন করলে?

তারপর আর একটা রহস্য হচ্ছে,—ভুজঙ্গের সাঙ্কেতিক প্রশ্ন! '১, ২, ৩,—এই তিন সংখ্যার ভেতর কোথায় আছে সেই হার?'

এ যে দেখ্ছি জামাই-ঠকানো প্রশ্ন রে বাবা! ১, ২, ৩-এর ওপর আবার ময়ূরকণ্ঠী হারের থাকাথাকি কি? এ যে হেঁয়ালী, একেবারে দুর্বোধ্য হেঁয়ালী! জীবনে কখনো ত' এমন গোলমালে পড়িনি!"

শঙ্কর যেন দিশেহারা হয়ে গেল! সে অন্যমনস্ক ভাবে বাগানের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে যেদিকে সেই পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল, সেখানে এসে উপস্থিত হল। সেখানে ছিল এক প্রকাণ্ড ঝাউগাছ। সে তারই পেছনে এসে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্দেহের উদয় হওয়ায় সে নীচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখল, গাছের গুঁড়ির ঠিক পেছনেই দুটো বড়-বড় গভীর জুতোর ছাপ। কেউ কোনো কারণে সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। শঙ্কর লক্ষ্য করে দেখ্ল, সে আর ভুজঙ্গ যেখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছিল—এই জায়গাটা থেকে তা স্পষ্ট দেখা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে এখানে লুকিয়ে সে সব কথা স্পষ্ট শোনা যায়।

একটু সতর্কভাবে পরীক্ষা করে শঙ্কর জুতোর ছাপের ভেতরে কিছু গঙ্গার মাটি আবিষ্কার করল।

চট্ করে তার মনে পড়ল যে গঙ্গার দূরত্ব এখান থেকে খুব বেশী হবে না। এখানে একটু আগে দাঁড়িয়ে যে তাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল, সে গঙ্গার দিক থেকেই এসেছিল বলে তার জুতোর ছাপের সাথে কিছু গঙ্গার মাটিও রয়ে গেছে, এবং সম্ভবতঃ এই লোকই সেই বিষাক্ত বাষ্পপূর্ণ কাচের আধারটা তাদের ওপর নিক্ষেপ করেছিল তাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্যে।

শঙ্কর নিঃশব্দে বাগান থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর হোটেলের দিকে চলতে-চলতে সে ভাবতে লাগল :

"ভুজঙ্গের সাথে এই অদ্ভুত রহস্যের সম্বন্ধ আছে তাতে সন্দেহ নেই। কে অমরবাবুকে হত্যা করেছে, এবং ঐ একই জাতীয় বিষাক্ত বাষ্পের সাহায্যে কে যে তাদেরও হত্যা করতে চাইছিল, এসব কথা এবং আরও অনেক কিছুই হয়ত ভুজঙ্গের জানা আছে! কিন্তু এত সব জানা থাকা সত্ত্বেও, সে আত্মরক্ষার জন্যও কখনো পুলিশের সাহায্য চাইবে না—চাইতে পারেও না। নিশ্চয়ই তার একমাত্র কারণ হচ্ছে,—অমরবাবুর কেনা ময়ূরকণ্ঠী হারটাতে ভুজঙ্গেরও কোন স্বার্থ ছিল। সে দাবী করছে, ময়ূরকণ্ঠী হার 'ন্যায়তঃ' তারই প্রাপ্য,—আর সেই কথা শাজাদা হুসেনের সেক্রেটারী মিঃ বোসেরও জানা আছে।

ভুজঙ্গের সেই দাবীটা নষ্ট করবার জন্যই কি তবে ভুজঙ্গকে এমন হত্যা-প্রচেষ্টা ?"

এগারো

অপরিচিত বৃদ্ধ

হোটেলে ফিরে এসে শঙ্কর তার ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল এক অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। শঙ্করকে প্রবেশ করতে দেখে তিনি বললেন, "আমি আপনার জন্যই এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছি।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাল; তিনি বললেন, "আপনার সাথে খোলাখুলি কথাবার্ত্তা বলাই সঙ্গত; সুতরাং সেই ভাবেই আমি বলব।

একটু থেমে তিনি বললেন, "অমর চৌধুরীর কিসে মৃত্যু হয়েছে, তা আপনি জানেন। কিন্তু কে তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী, তা নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাত?"

বৃদ্ধের কথা শুনে শঙ্কর বিস্মিত হলেও সে ভাব মুখে প্রকাশ না করে বলল, "আপনি কে, তা জানি না এবং আপনার এই অদ্ভুত প্রশ্নের কারণও আমার অজ্ঞাত।"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বলল, "আমি কে তা এখন আপনি না জানলেও কিছু ক্ষতি হবে না। তবে একটা কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন।

জমিদার অমর চৌধুরী এবং তার ভাই ভুজঙ্গ চৌধুরীর

সম্বন্ধে আমি কিছু গোপন সংবাদ জানি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে সন্ধ্যার সময়ে আপনি গঙ্গার ধারে আমার সাথে দেখা করবেন। ঘাটের উত্তর দিকেই আমার নৌকো বাঁধা থাকবে। আশা করি আপনাকে আমি এমন সংবাদ দিতে পারব যাতে ভবিষ্যতে আপনার যথেস্ট উপকার হবে।”

শঙ্কর প্রশ্ন করল, “আমার বিলাসপুর আগমনের উদ্দেশ্য আপনি জানলেন কি করে জিজ্ঞাসা করতে পারি ?”

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, “আপনার এই প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারলাম না বলে শঙ্করবাবু, আমি দুঃখিত। তবে এটুকু জেনে রাখুন যে, সমস্ত কিছুই আমি একটু-একটু জানি। যাই হোক, আপনি গঙ্গার ধারে আমার সাথে দেখা করতে রাজি আছেন ? অবশ্যি একথা ঠিক যে, অপরিচিত একজনের নিমন্ত্রণে তাঁরই নৌকোয় দেখা করতে যেতে হলে খুবই সাহসের দরকার। কিন্তু আমি আশা করি শঙ্করবাবু, আপনি ভীরু নন। সাহস ও শক্তি আপনার অফুরন্ত। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি যে, আপনি না হয়, রিভলভার নিয়ে সশস্ত্র হয়েই যাবেন। তাতে তো আর বিপদের আশঙ্কা বেশী কিছু থাক্‌তে পারে না !

কি বলছেন শঙ্করবাবু ? আপনার একটা পরিষ্কার জবাব পেলে খুবই খুশী হব। যাবেন তা হলে ? না, যাবেন না ? ভয় পাচ্ছেন ?”

সাহসী শঙ্করের আত্ম-বিশ্বাসে কে যেন তীব্র কশাঘাত

করলে! সে কিছু মাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিল, "না, ভয়ের কথা আমি ভাবছি না। আচ্ছা যাব,—ঠিক সন্ধ্যার সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত থাকব।"

শঙ্করের উত্তর শুনে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেসে বললেন, "ধন্যবাদ বন্ধু! আপনার সাহস আছে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।"

বলেই মুহূর্ত্ত-মধ্যে বৃদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং পর-মুহূর্ত্তেই প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য!

শঙ্কর তাকিয়ে দেখল, একখানি কালো রঙের মোটর গাড়ী একরাশ ধূলো ও ধোঁয়া উড়িয়ে গঙ্গার দিকে ছুটে যাচ্ছে!

বৃদ্ধ চলে যেতে ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়েই শঙ্কর চমকে উঠল। বৃদ্ধ তাঁর জুতোর কতকগুলো ছাপ তার ঘরের মেঝেতে রেখে গিয়েছিলেন। ভুজঙ্গবাবুর বাগানে শঙ্কর যে জুতোর ছাপ দেখেছিল, সে তার একটা মাপ সংগ্রহ করে পকেটে পূরে রেখেছিল। শঙ্কর পকেট থেকে তা বার করলে, তারপর দেখে বিস্মিত হল যে, সেই মাপটার সাথে বৃদ্ধের পায়ের ছাপ হুবহু মিলে গেছে! তার ঘরের মেঝেতে বৃদ্ধের জুতোর ছাপের সাথেও কিছু গঙ্গার মাটি লেগে রয়েছে!

এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে শঙ্করের একটা ধাঁধাঁ লাগল। প্রকৃত পক্ষে এই অপরিচিত বৃদ্ধ কে? খানিকক্ষণ আগে যে সেও ভুজঙ্গবাবুর বাগানে উপস্থিত ছিল, তা এই জুতোর চিহ্নই প্রমাণ করছে!

শঙ্করের নিজ মনেই প্রশ্নের উদয় হল ঃ "তাহলে এই বৃদ্ধই কি খানিক আগে তাকে ও ভুজঙ্গকে লক্ষ্য করে বিষ-বাষ্প ছুঁড়েছিল? তাইই যদি হয়, তাহলে এমন লোকের আমন্ত্রণে তার পাল্লায় যাওয়া, আর কেউটে সাপের মুখে হাত বাড়িয়ে দেওয়া—একই ব্যাপার নয় কি? যাওয়া তা হলে উচিত, কি অনুচিত?"

কিন্তু তখনই তার মনে হল,—"না কথা দিয়েছি। যাব নিশ্চয় কিন্তু একটু তৈরী হয়ে যেতে হবে, এই যা।"

বারো

বিপদ্-বরণ

ঠিক সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধের কথামত শঙ্কর গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড একখানি রক্তবর্ণ থালার মত সূর্য্যদেব তখন সেদিনকার মত পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছিলেন। নদীর জলে তার লাল রং আগুনের মত জ্বলছিল।

বৃদ্ধের কথিত সেই জায়গায় একটা মাঝারি গোছের নৌকো লাগান ছিল। নৌকোর দিকে তাকাতেই ছইয়ের ভেতরে বৃদ্ধের মুখ শঙ্কর দেখতে পেল। বৃদ্ধ তাকে দেখতে পেয়ে, ইঙ্গিতে নৌকোয় আসতে বলে আবার ছইয়ের ভেতরে অদৃশ্য হলেন।

এই অচেনা জায়গায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একজন অপরিচিতের সাথে নৌকোয় যাওয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে শঙ্কর একবার ইতস্ততঃ করল। এই বৃদ্ধ কে এবং তাঁর এই অযাচিত সাহায্যের উদ্দেশ্য কি, কিছুই সে জানে না। চারদিকের এই অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের সাথেও যখন সেই বৃদ্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তখন শত্রুপক্ষের ফাঁদে ভুলে পা দেওয়াও অসম্ভব কিছুই নয়!

তারপর আবার মনে হল যে ভয় করেই বা লাভ কি? বৃদ্ধের উদ্দেশ্য যে মন্দ, তারও ত কোন প্রমাণ নেই। বরং

তার কাছ থেকে এই ষড়যন্ত্রেরই কোনও অপ্রত্যাশিত সূত্র পাওয়া হয়ত অসম্ভব নয়। অন্ততঃ বৃদ্ধের কথা সত্য হলে তাই সম্ভব।

শঙ্কর বৃদ্ধের ইঙ্গিতমত নৌকোয় এসে উঠল। বৃদ্ধ তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আমি জানতাম আপনি আসবেন। এতক্ষণ তাই আপনার আশায় আমি এখানে অপেক্ষা করছিলাম!"

শঙ্কর নৌকোয় এসে উঠতেই বৃদ্ধের ইঙ্গিতমত নৌকো মাঝ-নদীর দিকে অগ্রসর হল; তাই দেখে হঠাৎ তার প্রাণ কেমন একটা অজ্ঞাত ভয়ে দুলে উঠল! কিন্তু সেই ভাব বাইরে প্রকাশ না করে সে বলল, "আপনার কথায় এই রকম কোনও ইঙ্গিত ছিল বলে ত আমার মনে পড়ে না!"

শঙ্করের এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝতে পেরে বৃদ্ধ বললেন, "ও তাও বটে! কিন্তু জেনে রাখুন যে, আমি যা ভাল বিবেচনা করেছি ঠিক সেই মতই কাজ করছি। নদীর ধারে আমার বক্তব্য প্রকাশ করা আমি ভাল বলে মনে করিনি। তাই নদীর মাঝখানে নৌকো নিয়ে যাচ্ছি। আপনি সাহসী গোয়েন্দা, এতেই যদি ঘাব্‌ড়ে যান, তাহলে বড়ই লজ্জার কথা!"

শঙ্কর মৃদু হেসে বলল, "ভয়ের কোনো কারণ আছে মনে করলে আমি এখানে আপনার সাথে দেখা করতে হয়ত আসতাম না! আর ভয়ের কারণ থাকলেই বা ক্ষতি কি? নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আমার যথেষ্টই আছে এবং আমি সেই ভাবেই তৈরী হয়ে এসেছি।"

বৃদ্ধের মুখে একবার মৃদুহাসি ফুটে উঠল। কিন্তু সে হাসিতে স্বর্গ না নরক, শঙ্কর তা বুঝতে পারলে না।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, মিঃ বোস নামে কোনো লোককে আপনি চেনেন ?"

শঙ্কর শান্তস্বরে উত্তর দিল, "অনেক মিঃ বোস আমার পরিচিত। আপনি কার কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

বৃদ্ধ বললেন, "আপনি বুঝতে পারছেন ঠিকই। আমি শাজাদা হুসেনের সেক্রেটারী মিঃ বোসের কথা বলছি। তাকে আপনি জানেন ?"

শঙ্কর কি উত্তর দিবে তাই ভাবছিল। বৃদ্ধ এক মুহূর্ত্ত তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, তখনই আবার প্রশ্ন করল, "কাজে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন ?"

বৃদ্ধের এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারলেও শঙ্কর বলল, "আপনার এই প্রশ্ন আমার ঠিক বোধগম্য হল না। কোন্ কাজের কথা বলছেন, একটু খুলে বলুন !"

বৃদ্ধ বললেন, "এখানে এসে অমরবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কতটুকু আবিষ্কার করেছেন; আমি তাইই জিজ্ঞেস করছি।"

শঙ্কর মুহূর্ত্তের জন্য একবার কি ভাবল! তারপর বলল, "বিশেষ কিছুই নয়—একমাত্র তার গুণ্ডা ভাইটিকে ছাড়া।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন, "বেশ! আর মিঃ বোস সম্বন্ধে ?"

শঙ্কর বলল, "দেখুন, আপনি এমন সব প্রশ্ন করছেন, যা আপনার পক্ষে আমি অনধিকার-চর্চ্চা বলে মনে করি।"

একটু হেসে বৃদ্ধ বললেন, "সে হচ্ছে আপনার অভিমত; কিন্তু আমার অভিমত হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমি মনে করি, এতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

শঙ্কর বলল, "আপনি আমায় বলেছিলেন যে, অমরবাবু ও ভুজঙ্গের সম্বন্ধে আপনি অনেক-কিছু জানেন, আপনি সে-সব কথা আমায় বলবেন। তা ছাড়া, আরো এমন সব কথা বলবেন যাতে আমার বিশেষ উপকার হয়। আপনার সেই প্রতিশ্রুতি পেয়েই আমার এখানে আসা। মিঃ বোস কে, তাঁর সম্বন্ধে আমি কি জানি বা অমরবাবুর মৃত্যু-সম্পর্কে আমি কতটুকু জানতে পেরেছি, এসব কথা গোপনীয়,—তা গোপন রাখতেই আমি বাধ্য। কাজেই এসব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি মোটেই রাজি নই। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনি আমায় এখানে এনেছেন, আপনার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন,—তাহলেই খুশী হব।"

বৃদ্ধ বললেন, "আপনার খুশী বা অখুশী হওয়ার ওপর আমার কিছুই নির্ভর করে না। কিন্তু আমার খুশী বা অখুশী হওয়ার ওপর অনেক-কিছুই নির্ভর করে শঙ্করবাবু!"

—"তাই নাকি?" বলে শঙ্কর একটু সতর্কসূচক ভাবে তার পকেটের রিভলভার স্পর্শ করলে।

শঙ্করকে তার পকেট স্পর্শ করতে দেখে বৃদ্ধ হেসে বললে, "থাক্—থাক্ শঙ্করবাবু! আর কষ্ট করে পকেটে হাত ঢোকাতে হবে না।

আপনি রিভলভার নিয়ে তৈরী হয়ে আসবেন একথা আমার ভালরূপেই জানা ছিল। তাই আপনার মত বোকা গোয়েন্দাকে শায়েস্তা করবার জন্য বন্দোবস্ত করতে হয়েছে একটু অন্যরকম। কিন্তু সে বন্দোবস্তটা কিছু বৈজ্ঞানিক। আপনার মত নিরেট মস্তিষ্কের পক্ষে তা একেবারেই বোধগম্য হবে না, তা জানি। তবু সাবধান করে দিচ্ছি আগে থাকতেই। মিছামিছি কষ্ট করবেন কেন শঙ্করবাবু? রিভলভার বা রাইফেলের গুলি এই ছোট্ট নৌকোর আবহাওয়ায় আজ একেবারেই অচল!

ইচ্ছা হলে ট্রিগার টেনে দেখতে পারেন, কিন্তু গুলি বেরুবে না একটুও। নৌকোর সুমুখ দিকে ঐ যে একটি যন্ত্র দেখছেন, ভস্-ভস্ করে আওয়াজ হচ্ছে, ওরই প্রসাদে, এই নৌকো ও তার চারদিক্‌কার বিশ-পঁচিশ হাত জায়গা জুড়ে যত বায়ুমণ্ডল, সবটাই এখন এমন বাষ্পে ভরপূর যে, বারুদ বা আগুন এর কাছে ব্যর্থ!

তা ছাড়া, নৌকোখানি ছোট হলেও এতে লোকজন বা অস্ত্রবলের অভাব নেই। কাজেই যা বলছি, তা শুনুন শঙ্করবাবু!—"

হঠাৎ শঙ্করের মাথায় একটি দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল।

—"বটে!" এই কথা বলে একটা প্রচণ্ড হুঙ্কারের সঙ্গে শঙ্কর তার সমুখের টেবিলটায় এত জোরে পদাঘাত করলে যে, তা মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃদ্ধের বুকে তীব্র আঘাত করে তাকে ভূপাতিত

করে ফেললে। সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্কর তার রিভলভার বার করেই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিলে। কিন্তু আশ্চর্য্য! হিংস্র নিদারুণ রিভলভারও নিরীহ পুতুলের মত নীরব রয়ে গেল—গুলি বেরুল না!

শঙ্করের পদাঘাত ও বৃদ্ধের আর্ত্তনাদ শোনামাত্র ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যমদূতের মত কয়েকটি লোক সেই কেবিনের দিকে এগিয়ে এসেছিল। শঙ্কর তাদেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে বাইরে বেরিয়ে এলো—আর তখনই মুহূর্ত্তমধ্যে নদীর উত্তাল তরঙ্গে শব্দ হল, ঝপাৎ! নৌকোয় একটা কলরব পড়ে গেল।

শঙ্করকে লক্ষ্য করে বৃদ্ধের নৌকো তখনি তার মুখ ফিরালে। কিন্তু পেছন হতে তৎক্ষণাৎ প্রায় ৫।৭ খানি জেলে ডিঙ্গীর মাঝি-মাল্লারা চীৎকার করে উঠল, "এইয়ো,—খবর্দ্দার!"

তাদের সংখ্যা আর যমদূতের মত আকৃতি ও সাহস দেখে বৃদ্ধের নৌকোর মাঝিরা প্রমাদ গুণলে। তারা তখনি পেছন দিকে নৌকোর মুখ ফিরিয়ে বায়ুবেগে ছুটে চলল।

আর সেই বৃদ্ধ?—

তিনি তখন আহত দেহে—স্তম্ভিত ভাবে—হতবুদ্ধির মত নৌকোর ছাদে বসে পেছন দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গোয়েন্দা শঙ্কর সেন তার আত্মরক্ষার জন্য কেবল যে তার পকেটের রিভলভারের ওপরই নির্ভর করে নাই, বিপদে-

আপদে তাকে অনুসরণ করবার জন্য যে কতকগুলি জেলে-মাঝিকেও নিযুক্ত করে রেখেছিল, বৃদ্ধ তার পরিচয় পেয়ে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেলেন !

স্রোতের অনুকূলে নৌকোয় যেতে-যেতে বহুদূর হতে বৃদ্ধের চোখে পড়ল যে, জেলে-মাঝিরা শঙ্করকে জল থেকে টেনে তুলছে।

বৃদ্ধের বুক চিরে হতাশের একটা দীর্ঘশ্বাস সশব্দে বেরিয়ে এলো।

তেরো

নূতন চাল্

ডাক্তার চলে যেতেই গোয়েন্দা শঙ্কর সেন একবার উঠে বসবার চেস্টা করল; কিন্তু শরীর তখনো এত দুর্বল যে, সে পারল না,—তখনই পড়ে গেল!

অসীম ছুটে এসে তাকে আবার শুইয়ে দিয়ে বললে, "এ তুমি করছ কি শঙ্কর? ডাক্তার বলে গেলেন, তোমার এখনো পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক; আর তুমি এখনই উঠে বসবার চেস্টা করছ?"

শঙ্কর বলল, "অসীম! ডাক্তার যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না অসীম, কি ভয়ানক দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপে বসে আছে! এখনই এই মুহূর্তে যদি কোন পন্থা অবলম্বন করা না হয়, তাহলে যে সব-কিছু ভেস্তে যাবে!"

অসীম বলল, "আমি তা সবই বুঝতে পারছি শঙ্কর! কিন্তু তুমি যদি নিজে বেঁচে ওঠ, যদি শক্ত-সমর্থ হয়ে ওঠ, কেবল তাহলেই ময়ূরকণ্ঠী হার ও অমরবাবুর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত হতে পারে। পুলিশ ত আজও এ-ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে! আমি স্পস্ট বুঝতে পারছি, তুমি

এ ব্যাপারের নিশ্চয়ই কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছ। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে শঙ্কর, তুমি নিজে কয়েকদিন পেছনে থেকে পুলিশকে হুকুম কর কি করতে হবে, আর আমাকে হুকুম কর কি করতে হবে।

আমি সেজন্য পাশের ঘরে দাশুবাবুকে এনে বসিয়ে রেখেছি। তোমার সাঙ্ঘাতিক অবস্থার কথা শুনে সে ভদ্রলোকও একেবারে মুষড়ে গেছেন! ডাক্তারের বারণ বলে তাঁকে এখনো এখানে আসতে দিইনি।"

"বল কি অসীম!" শঙ্কর উত্তেজিত ভাবে আবার বলল, "দাশুবাবু বসে আছেন অন্য ঘরে! না, না,—এই মুহূর্ত্তে তাঁকে নিয়ে এসো। তোমাদের সকলের মাঝখানে থেকে আমার যদি মৃত্যু হয়, সে মৃত্যুও আমার কত আনন্দের, কত সুখের!—"

"কিন্তু তা আর হচ্ছিল কই শঙ্কর! তুমি যে মরতে যাচ্ছিলে একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, উত্তাল নদীর বুকে," বলতে-বলতে সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকলেন দাশুবাবু।

তিনি আবার বললেন, "তোমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই এসে পড়েছি শঙ্কর! তোমার গলার স্বর শুনেই কৌতূহলী হয়েছিলাম। শুনলুম, মরণ হলেও তুমি আমাদের সুমুখেই তা বরণ করে নিতে চাও। তাহলে আর ঘরে ঢুকতে আপত্তি কি?

তা যাক, এখন বল তুমি, কি আমাদের কর্ত্তব্য! আমাদের

সমস্ত পুলিশ-বাহিনী আজ নতমস্তকে তোমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে।”

লজ্জিত ভাবে শঙ্কর বলল, “ওসব কি কথা বলছেন দাশুবাবু? বিনয়েরও একটা সীমা আছে ত?”

দাশুবাবু তাঁর চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, “বিনয় নয় শঙ্কর! জান ত আমি কাজ করি পুলিশ-লাইনে—জাঁদরেল পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর আমি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অমরবাবুর হত্যাকাণ্ডে আমি একেবারে বোকা বনে গেছি!

যে লোকটি পুলিশের সাহায্য নিয়েছিল, নিজের প্রাণ বা সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য,—পুলিশের একটা পদস্থ কর্ম্মচারী হয়ে আমি তাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলাম বটে, কিন্তু মাথায় আমার এতটুকু বুদ্ধির উদয় হল না যে, সেইখানেই পুলিশের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায় না! তাকে এর পরেও চোখে-চোখে রাখা উচিত ছিল, এ জ্ঞানটা আমার একেবারেই হল না শঙ্কর!

আর তুমি—একজন সখের গোয়েন্দা, নিছক খেয়ালের বশেই তুমি গেলে নিলাম-ঘরে। কিন্তু সেইখান থেকেই সুরু হল তোমার কর্ম্মজীবন। শেষকালে তারই ফলে যমের দুয়ার পর্য্যন্ত ঘুরে এলে তুমি!

কাল বিকেলে পুলিশ-সুপার মিঃ হল্যাণ্ডের সঙ্গেও আমার এই কথাই হচ্ছিল। তিনি তোমার বিশেষ সুখ্যাতি করে বললেন, ‘মনে রেখো, শঙ্কর নিশ্চয়ই ঠিক জায়গামত ঘা

দিয়েছে। নইলে তাকে খুন করবার বা বন্দী করবার এমন চেষ্টা কেন? তোমাকে বা আমাকে তো কেউ মারতে আসছে না! তার মানেই হচ্ছে, শঙ্কর নিশ্চয়ই কোন সূত্র আবিষ্কার করেছে। সুতরাং এখন আমাদের কর্ত্তব্য হবে নির্ব্বিচারে তার উপদেশ অনুযায়ী তাকে সাহায্য করা।' তাঁরই হুকুম মত আমি তোমাকে জানাচ্ছি, সমস্ত পুলিশ-বাহিনী আজ নতমস্তকে তোমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে।

কাজেই, তুমি নিজে কয়েকদিন বিশ্রাম কর শঙ্কর! বরং সম্ভবপর হলে আমাদের বল, আমরা তোমাকে এখন কি ভাবে সাহায্য করতে পারি!"

শঙ্কর মুদিত নেত্রে দাশুবাবুর সবগুলি কথা শুনে গেল; কিন্তু গভীর ক্লান্তি ও অবসাদে সে তখন এমন অভিভূত যে, সহজে সে কোন কথা বলতে পারলে না।

প্রায় তিন-চার মিনিট আরো এই ভাবেই কেটে গেল। তারপর সে একবার ঈষৎ চোখ খুলে পরক্ষণেই আবার তা বন্ধ করল।

দাশুবাবু তার কাছে এগিয়ে যেয়ে কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "কিছু বলবে শঙ্কর?"

শঙ্কর ক্ষীণস্বরে বললে, "হাঁ।" তারপর ডাকল, "অসীম! দাও ত একবার।"

অসীম কাচের গ্লাসে একটু ব্রাণ্ডি নিয়ে তার মুখে ঢেলে দিলে।

শঙ্কর আরো খানিকক্ষণ নীরব থেকে, অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে ক্ষীণস্বরে বলতে লাগল : "দাশুবাবু! অনেক খুনী-বদ্‌মায়েস দেখেছি, অনেক বৈজ্ঞানিক দেখেছি। কিন্তু সেদিন যা দেখেছি, এমনটির তুলনা হয় না। সৌম্য বৃদ্ধের প্রশান্ত মুখের অন্তরালেও যে সাপের হিংস্র বিষ লুকিয়ে থাকতে পারে, তা কেবল সেদিনই দেখেছি।

কেবল তাই নয়,—বৈজ্ঞানিক সে, এক অপরূপ বৈজ্ঞানিক! এমন কথা শুনেছেন কখনো দাশুবাবু যে রিভলভারের গুলি পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়? ট্রিগার টিপলেও গুলি বেরুবে না এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি সেদিন কেবল আমিই দেখে এসেছি। তাই অতি অসহায় হয়ে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল!

তবে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, আমি কেবল আমার নিজের ক্ষমতার ওপরই সেদিন নির্ভর করি নাই। কতকগুলো জেলে-মাঝির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আমি অনিশ্চিত বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছিলুম। আমার অবসন্ন দেহটি তারাই সেদিন রক্ষা করেছিল। তাদের উপদেশ দেওয়া ছিল, তেমন-কোন বিপদ-আপদ মনে হলে তারা যেন আমায় বিলাসপুর থানায় পৌঁছে দিয়ে দারোগাকে জানিয়ে দেয় যে, আমি পুলিশের লোক—কলকাতায় পুলিশ-আফিসে টেলিগ্রাম করে, কাউকে যেন বিলাসপুরে যেতে বলে।

তারই ফলে দাশুবাবু, আপনার মত বন্ধু সেদিন আমাকে নিয়ে আসবার সুযোগ পেয়েছিল।"

দাশুবাবু স্তব্ধভাবে সমস্ত কথা শুনে গেলেন। তারপর বললেন, "যাহোক্, ভগবানকে ধন্যবাদ শঙ্কর, তুমি যে বেঁচে উঠেছ। এখন বল, আমরা কি ভাবে তোমাকে এই কাজে সাহায্য করতে পারি। মিঃ হল্যাণ্ড তোমার জবাবের আশায় তাঁর বাংলোয় অধীর ভাবে অপেক্ষা করছেন। তাঁর আদেশ হচ্ছে, 'নির্ব্বিচারে শঙ্করের আদেশ পালন করে যাও।' আমরা তাইই করতে চাই শঙ্কর!" দাশুবাবু বললেন।

—"বেশ, তবে শুনুন।" এই বলে শঙ্কর তখনই আবার নীরব হল। তার ইঙ্গিতে অসীম আবার একটু ব্রাণ্ডি এনে তার মুখের ভিতর ঢেলে দিল।

শঙ্কর বলতে লাগল: "দাশুবাবু! বিলাসপুরে অমরবাবুর বাড়ীতে এখন তার ভাই ভুজঙ্গ চৌধুরী বাস করছে। লোকটার সঠিক পরিচয় আমি এখনো পাইনি। কেবল এইটুকু জানতে পেরেছি, সে বদ্‌মেজাজী হলেও কিছু বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে থাকে। বিলাসপুরে এসেই সে একটা গুপ্তঘরে তার ল্যাবরেটরী সাজিয়ে বসেছে।

দাদার প্রতি তার সম্ভবতঃ কোন আকর্ষণই ছিল না। এমন কি, যে বিষাক্ত গ্যাসে তার দাদার মৃত্যু, হয়ত সেই গ্যাসের জন্ম হয়েছিল তারই ল্যাবরেটরীতে। কিন্তু আমি একথা হলফ্ করে বলতে পারি, সে নিজে কখনো হত্যাকাণ্ডের নায়ক নয়।

সে জানে অনেক কথাই; কিন্তু তবু নিজে সে খুন করেনি। শুধু তাই নয়, খুনীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও সে

নিজেও নিরাপদ নয় একেবারেই। দাশুবাবু, আপনাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য হবে সেই ভুজঙ্গকে চোখে-চোখে রাখা। কোন্ কোন্ লোক তার কাছে আসে, কেন আসে, তার খোঁজ নিতে হবে ; এবং সে যাতে কোন বিপদে না পড়ে, তা দেখতে হবে।

দ্বিতীয় কাজ : শাজাদা হুসেন ও তাঁর সেক্রেটারী মিঃ বোস এখন কোথায়, তা খুঁজে বার করা। মলঙ্গা লেনের বাড়ী থেকে তারা গেল কোথায় ? কলকাতার বাইরে গেছে ? না কলকাতায়ই রয়ে গেছে ? সেদিন নিশ্চয়ই কোন গাড়ী-ঘোড়ার সাহায্য তারা নিয়েছিল। তা নইলে অত মাল-পত্র নিয়ে যাওয়া ত সম্ভবপর হয়নি ! কাজেই গাড়ী-ঘোড়া ও মুটে-মজুরের কাছে খোঁজ করতে হবে।

তৃতীয় কাজ : ১২৩নং রিক্‌শা-গাড়ী কার ? কিন্তু মনে রাখবেন ১২৩নং কখনো ৩২১ বা অন্য কোন নম্বর ঝুলিয়েও রাস্তায় বেরুতো। কাজেই, নম্বরটা হয়ত একেবারেই নকল ! আমি অসীমকে খোঁজ করতে বলে গিয়েছিলুম, কিন্তু অসীম তার কিছুই করতে পারে নি।

তা ছাড়া আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে দাশুবাবু ! কাজটা কি জানেন ? একটা জ্যান্ত মানুষকে মারতে হবে, আর একটা মরা মানুষকে বাঁচাতে হবে।”

অতি বিস্ময়ের সঙ্গে দাশুবাবু বললেন, “সে আবার কেমন কথা ? তুমি কি যত সব হেঁয়ালী ছাড়া কিছু বলতে পার না ?”

একটু হেসে শঙ্কর বলল, “হেঁয়ালী নয় দাশুবাবু, সত্যি

কথা। কথাটা হচ্ছে,—দু' দিনের মধ্যে আপনাদের প্রচার করে দিতে হবে যে, গোয়েন্দা শঙ্কর সেন নৌকো-ডুবির ফলে মুমূর্ষু ভাবে ছিল ; কিন্তু সহসা তার মৃত্যু হয়েছে !"

বলেই শঙ্কর হেসে ফেলল। অন্যান্য সকলেও হেসে ফেলল।

শঙ্কর আবার বলতে সুরু করল, "বেশ ভড়ং করে, ছবি দিয়ে খবরের কাগজেও খবরটা বার করা চাই। এই হল একটা জ্যান্ত মানুষকে মারা।

আর একটা কাজ হচ্ছে, একটা মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা। সেই প্রচার-কার্য্যটা হবে এই রকম :—

জমিদার অমর চৌধুরী মারা গেছেন আজ ক'দিন। তাঁর পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষা হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে মর্গে এক অসাধারণ সন্ন্যাসীর উদয় হয়েছিল। এখন তাঁরই কৃপায় অমর চৌধুরী পুনর্জ্জীবন লাভ করেছেন—তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হচ্ছেন। এখনো তিনি বাক্‌শক্তি ফিরে পাননি। কথা বলবার শক্তিটা এসে গেলেই সম্ভবতঃ তাঁর হত্যা-রহস্যের একটা কিনারা হয়ে যাবে। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ করা যাচ্ছে, এমন একটা আনন্দের খবর পেয়েও তাঁরা যেন তাঁকে বিরক্ত করতে না আসেন। একটি রুদ্ধ গৃহে, দুটি খরগোশ ও দুটি ছাগলের সঙ্গে তাঁকে আরও চারদিন নীরবে থাকতে হবে, এই হচ্ছে সেই সন্ন্যাসীর আদেশ।

দাশুবাবু! আপাততঃ এই পর্য্যন্তই হচ্ছে আমার অভিপ্রায়। আপনি ত অনেক-কিছুই অসাধ্য-সাধন করতে

পারেন। দেখুন না, এই কটা কাজের ভার আপনি নিতে পারেন কিনা! তারপর এসব গোছ-গাছ করে নিতে-নিতে আমি হয়তো সত্যই সেরে উঠব।”

ঈষৎ হেসে দাশুবাবু বললেন, “তুমি সেরে উঠলেই বা তোমায় ছাড়ে কে? তুমি ত কাল বাদে পরশু দিনই মরে ভূত হয়ে যাবে—আমি তার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। ছাখো না গোয়েন্দা শঙ্কর সেনকে মেরে, সারা সহরে একটা কান্নার রোল তুলে দিই কেমন করে!”

—“তা দিন; কিন্তু ভুজঙ্গের কথাটাও মনে রাখবেন।” শঙ্কর বলল।

দাশুবাবু চেয়ার থেকে উঠতে-উঠতে বললেন, “হাঁ, সে কথা আমার বেশ মনে থাকবে।”

চৌদ্দ

আবার হত্যা-প্রচেষ্টা

গোয়েন্দা শঙ্কর সেনের অভিপ্রায় অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই হয়ে গেল—দাশুবাবু নিজে চলে গেলেন বিলাসপুর—ভুজঙ্গের রক্ষাকার্য্যের ভার নিয়ে। তারপর মাত্র দু'তিন দিনের ব্যবধানে দু'টি চমকপ্রদ সংবাদ পড়ে জনসাধারণ অভিভূত হয়ে গেল।

সংবাদ দুটির একটি হল গোয়েন্দা শঙ্কর সেনের মৃত্যু-বিবরণ, আর একটি অলৌকিক সংবাদ—নিহত অমরবাবুর জীবনপ্রাপ্তি।

শঙ্করের মৃত্যুতে সারা সহরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল! ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্ম্মী অসীম গুপ্ত শোকে মুহ্যমান হয়ে শয্যাগ্রহণ করল।

একই কলকাতা শহরের একাংশে যখন এমন একটা গভীর শোকের ছায়া,. তখন তার অপরাংশে—মোহনলাল ষ্ট্রীটে—পরম কৌতূহল ও আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে! সবারই মুখে এক কথা,—"সন্ন্যাসীর কৃপায় মৃতের পুনর্জ্জীবন-লাভ!"

জমিদার অমর চৌধুরীকে সকলেই যেয়ে দেখে আসতে লাগল। তিনি বিমর্ষ মলিন মুখে বিছানায় শয়ান। তাঁর খাটের তলায় খরগোশ দুটো ছুটাছুটি করছে, আর ছাগল

দুটি নির্ব্বিকার ভাবে ঘরের একপাশে চুপটি করে বসে আছে।

ঘরে একটি মৃদু আলো। তবু কপাটের কাঁচ দিয়ে তাঁকে দেখতে কারোই অসুবিধা হয় না।

দেখে আসতে পারে সবাই, কিন্তু কেউ কোন কথা বলবার অধিকারী নয়। সন্ন্যাসী নিজে ও গুটিকয়েক ডাক্তার,—সবাই অমরবাবুকে পাহারা দিচ্ছিলেন,—কেউ যেন তাঁকে কোনরূপে বিরক্ত না করে, সেদিকে ছিল সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি।

সন্ন্যাসীকে দেখবার জন্যই বা কি ভয়ঙ্কর ভীড়! ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ—সবাই তাঁকে দেখবার আশায় সারাদিন জমা হয়ে থাকে। বলিষ্ঠ, সুগৌর, দীর্ঘকায় বৃদ্ধ পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী তাদের আকুল আগ্রহে দিনে দু'বার মাত্র—সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের দর্শন দেন। অন্য সব সময় তিনি অমরবাবুর পাশের ঘরেই তাঁর জপ-তপ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

সন্ধ্যার পর হতেই ভীড় কমে যায়, সারা মোহনলাল ষ্ট্রীট একমাত্র সেই সময়েই যেন বিশ্রামের অবকাশ পায়!

চারদিনের দু'দিন কেটে গেছে। সন্ন্যাসী ঘোষণা করেছেন, আর মাত্র দু'দিন গেলেই অমরবাবু তাঁর বাক্‌শক্তি ফিরে পাবেন, তাঁর মস্তিষ্কও ক্রমশঃই সুস্থতা লাভ করবে। খবরের কাগজের সম্পাদকগুলো এখন হতেই তারস্বরে চীৎকার সুরু করেছে, অমরবাবু তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা লাভ

করলেই এই জঘন্য হত্যা-প্রচেষ্টার সমগ্র রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। কাজেই, সকলে অধীর আগ্রহে এ দুটো দিনও কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

রাত্রি গভীর—চারদিক অন্ধকার। অমরবাবুর সুবিশাল প্রাসাদ তারই মাঝে একটা জমাট কালো পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই মনে হয়, না জানি কত রহস্য, কত বিভীষিকা ও ষড়যন্ত্র ঐ দৈত্যের মত বিরাটদেহ বিপুল প্রাসাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বিলীন হয়ে আছে!

এমনই সময়ে একখানি রিক্‌শা-গাড়ী অতি নিঃশব্দে সেই প্রাসাদের পেছন দিকে এসে দাঁড়াল। গাড়ীর আরোহী চুপি-চুপি গাড়োয়ানকে কি বলতেই সে গাড়ীখানাকে খানিকটা দূরে রেখে এলো, তারপর প্রাসাদের একটা পাইপ বেয়ে অতি অভ্যস্ত বানরের মত সুকৌশলে ওপরে উঠে গেল।

অমরবাবু শুয়ে আছেন—তাঁর ঘরের জানালা খোলা, দরজা ভেজান। ঘরের বাইরে তাঁর একটি পুরাতন ভৃত্য চিরদিনের অভ্যাস মত সেদিনও শুয়ে ঘুমিয়ে আছে।

রিক্‌শার গাড়োয়ান এ-জানালা, ও-জানালা করে,—অবশেষে একটা বড় জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। মুহূর্ত্তকাল সে কি একটু চিন্তা করে, পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু সহসা এমন একজন অপরিচিত অতিথির আগমনে খরগোশ ও ছাগলগুলির মধ্যে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হল—তারা এ-কোণ ও-কোণ করে ছুটাছুটি করতে লাগল,—

...লোকটা থমকে দাঁড়াল। [পৃঃ—১০৩

একটা ছাগল ভীত হয়ে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করে চীৎকার করে উঠল।

ঘরে ঢুকেই গাড়োয়ান তার কোমর হতে একখানি শানিত ছোরা বার করে নিয়েছিল, তারপর বদ্ধ দৃষ্টিতে অমরবাবুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সহসা ছাগলের চীৎকারে সে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে শঙ্কিত ভাবে একবার ছাগল দুটোর দিকে তাকাল, তারপর কি যেন সন্দেহ করে সে ছোরা-হাতে নীরব ছাগলটার ওপর তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিস্তলের একটা শব্দ! আর পরক্ষণেই গাড়োয়ানের সংজ্ঞাহীন দেহ ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল—সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত বাড়ীঘর বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পনেরো

অজ্ঞাত অতিথি

ভোর হতেই লোকের মুখে-মুখে প্রচারিত হয়ে পড়ল গোয়েন্দা শঙ্কর সেনের সহকর্ম্মী অসীম গুপ্তের বাহাদুরীর কথা।

বন্ধুর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পডলেও, অসীম তার বন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল—সে সঙ্কল্প করেছিল. যেমন করেই হোক, অমরবাবুর হত্যাকারীকে সে গ্রেপ্তার করবেই। তাই সে একটা ছাগলের বেশে অমরবাবুর ঘরেই এতদিন বাস করছিল।

সে আশঙ্কা করেছিল, অমরবাবু বেচে উঠেছেন শুনলে শত্রুরা তাঁকে মারবার জন্য আর একবার চেস্টা করবেই।

কার্য্যতঃ হলও তাই। এবারও এক হত্যাকারীর আবির্ভাব হল। কিন্তু দুটো ছাগলের মাঝে একটাকে নীরব দেখে, হত্যাকারী তখনই একটা বিপদ আশঙ্কা করে ছাগলবেশী অসীমের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করে অসীমের পিস্তল গর্জ্জন করে ওঠে।

লোকের মুখে-মুখে একথাও শোনা গেল যে, অসীমের গুলি নাকি লোকটার দেহে কিছুমাত্র আঘাত করেনি, অথচ আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ছটফট করতে-করতে সে পৃথিবীর পরপারে চলে গেছে!

ডাক্তাররা নাকি বলেছেন, এরও মৃত্যু হয়েছে বিষক্রিয়ার ফলে। কিন্তু কেমন করে, কখন যে বিষক্রিয়া হল, সে রহস্যের কেউ সমাধান করতে পারে নাই।

যাহোক, অসীমের গুলিতে তার মৃত্যু না হলেও অসীমকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না,—এবিষয়ে সকলেই একমত। শঙ্করের মত বন্ধু হারিয়েও সে যে সুস্থ মস্তিষ্কে এমন একটা কৌশলের অবতারণা করেছিল, তাইই হচ্ছে তার কৃতিত্বের পরিচয়। আর সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, অমরবাবুর অদেষ্ট ভাল,—শত্রুর আক্রমণে তাঁকে আর দ্বিতীয়বার প্রাণ হারাতে হল না! কিন্তু তারও মূলে যে অসীম, সে কথা অস্বীকার করবার জো নাই।

খবরের কাগজগুলো এই ঘটনার উল্লেখ করে, আরো একটা বিষয়ের সন্ধান দিলে। তারা বললে, অমরবাবুর বাড়ীর পেছন দিকে নাকি একখানা রিক্শা-গাড়ী পাওয়া গেছে—গাড়ীটার নম্বর ২৩১; এই গাড়ী দিয়ে পুলিশ অনেক-কিছু আবিষ্কারের আশা রাখে।

*   *   *   *

সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে বিলাসপুর ষ্টেশনে এক আগন্তুকের আবির্ভাব হল। রাত তখন প্রায় ১০টা, সে মনে-মনে একটা মতলব ঠিক করে নিয়ে ষ্টেশন থেকে সোজা ভুজঙ্গ-বাবুর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

চারদিক নিস্তব্ধ। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়েছে মনে করে আগন্তুক অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানের ভেতর ঢুকল।

খানিকটা এগিয়ে সে একটা বড় গাছের নীচে এসে দেখল, গাছের গুঁড়িটার ঠিক নীচেই একটা প্রকাণ্ড ক্যালো কুচকুচে বিরাট হাউণ্ড নিস্তব্ধ ভাবে পড়ে আছে। আগন্তুক নীচু হয়ে দেখল যে, সেটা মৃত। কেউ তার ঘাড়টা মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছে।

আগন্তুক বুঝতে পারল, তাহলে অন্ধকার বাগানে সে ছাড়া আরো একজন কেউ নিশ্চয়ই উপস্থিত আছে! সম্ভবতঃ হাউণ্ডটার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সেই লোকই হাউণ্ডটাকে হত্যা করেছে। কিন্তু কে এই অজ্ঞাত অতিথি? আর কি তার মৎলব?

সে ডান হাতে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

ষোল

মিঃ বোস ও ভুজঙ্গ

বাগানের দিকের সব দরজা-জানালা বন্ধ দেখে সে একটু চিন্তিত হল। সেগুলো ভেতর থেকে এমনভাবে বন্ধ যে, হাজার চেষ্টা করলেও বাইরে থেকে সেগুলো খোলা যাবে না।

সে দেখলে, সামনেই একটা প্রকাণ্ড গাছের ডাল বাড়ীটার ছাদের কাছে এসে পড়েছে বটে—কিন্তু ছাদ ও গাছের ডালের ব্যবধান মোটেই উৎসাহজনক নয়। সেখান থেকে লাফিয়ে ছাদে যেতে হলে যদি একটু এদিক-ওদিক হয়, তাহলে নির্ঘাৎ মৃত্যু!

অথচ এছাড়া বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করবার আর কোনো উপায়ও নেই! কাজেই সাহসে ভর করে সে তার কর্ত্তব্য ঠিক্ করে ফেললে। সে ধীরে-ধীরে গাছে উঠে ডালটার একেবারে আগায় এসে উপস্থিত হল; তারপর সমস্ত ভয়-ডর পরিত্যাগ করে, ডালটাকে দুবার দুলিয়ে নিয়ে, দিল এক লাফ!

তার পায়ের তলা শির্-শির্ করে উঠল। কিন্তু শুধু এক মুহূর্ত্ত! পরক্ষণেই দেখল, ছাদের একধারে একেবারে কার্নিশ ঘেঁসে সে ছাদে এসে পড়েছে! আর একটু ওদিকে পড়লেই হয়েছিল আর কি!

সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগ্ল। সামনে একটা অন্ধকার

বড় বারান্দা। বারান্দাটা পার হয়েই একটা প্রকাণ্ড হল্‌ঘর। তারপর আরো দুখানা ঘর ছাড়িয়ে আগন্তুক একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভেতরে তখন আলো জ্বলছিল। সে দেখলে, ঘরের ভেতরে স্বয়ং ভুজঙ্গবাবু ও আর-একজন লোক। সে খানিকটা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল; তাই ভাল করে দেখা যায় না!

আগন্তুক শুনতে পেল, ভুজঙ্গ বজ্রাহতের মত চম্‌কে বিহ্বল স্বরে তাকে জিজ্ঞেস্ করলে, "তুমি! তুমি এখানে এলে কি করে? আমার হাউণ্ড কি তোমায়—"

কঠিন কণ্ঠে উত্তর এলো, "হাঁ, সে আমায় বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তোমার সেই অপূর্ব্ব প্রহরীর দর্শনলাভ ত বেশীক্ষণ বরদাস্ত করা চলে না! কাজেই তাকে শেষ করে দিয়েছি! তা যাক্, সে কথা নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। আমাকে দেখে যে তুমি মোটেই আনন্দিত হবে না, তা আমি জানি।"

ভুজঙ্গ জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তুমি এখানে আমার কাছে এসেছ কেন?"

উত্তর এলো, "কেন এসেছি তাও তোমাকে বলে দিতে হবে? তুমি আমাদের ডোবাতে বসেছ ভুজঙ্গ! শঙ্কর সেনকে তুমিই বলেছিলে যে, ময়ূরকণ্ঠী হারছড়ায় তোমার একটা ন্যায়-সঙ্গত দাবী রয়েছে, আর সেই দাবীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য তুমি তাকে অনুরোধ করেছিলে। কেমন, তাই নয় কি?"

ভুজঙ্গ বলল, "হাঁ, তা বলেছি বটে। কিন্তু সে ত তোমাদেরই দোষে বলতে হয়েছে। হারটা নিয়ে সরে পড়লে। কিন্তু হারটা নেবার ফন্দীটা যে বার করে দিলে, যার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত পাকা ছিল যে হারটা তাকে দিয়ে দেবে, আর সে তোমাদের পারিশ্রমিক বাবদ বিশহাজার টাকা দেবে, শেষকালে কি না ঠকাতে গেলে তাকেই ?

মিথ্যা একটা গুজব আমাকে জানিয়ে গেলেন শাজাদা হুসেন যে, মিঃ বোসকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। কাজেই তখন আশঙ্কা হল তুমি হয়ত মালশুদ্ধই গ্রেপ্তার হয়ে থাকবে। কিন্তু পুলিশ-মহলে ও জনরবে তেমন কোন কথা না শুনে একবার মনে হল, মালটা তুমি হয়ত কোথাও সরিয়ে ফেলেছ !

তাই যদি হয়ে থাকে, মালটা উদ্ধার করতে হবে ত ? কিন্তু কোথায় রেখেছ কে জানে ? জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—অর্থাৎ কোন ডোবা-গর্ত্তে, না জলাশয়ে, অথবা কোন উঁচু জায়গায়,—তাই জানবার জন্য শঙ্করের মারফৎ তোমারই পরিচিত একটা সাঙ্কেতিক প্রশ্ন করেছিলাম যে, মালটা আছে কোথায় ?—১, ২, ৩, এই তিন সংখ্যার ভেতর কোথায় আছে, শুধু তাই জানতে চেয়েছিলাম।"

বিদ্রূপের স্বরে জবাব শোনা গেল, "খুব করেছিলে ভুজঙ্গ ! চমৎকার তোমার বুদ্ধি ! তোমারই কথায় শঙ্কর বুঝে নিয়েছে যে, মিঃ বোস নামক লোকটিই ময়ূরকণ্ঠী হার নিয়ে সরে

পড়েছে, সুতরাং অমরবাবুর খুনী হয়ত সেই মিঃ বোস ! যে লোকটা জানত না কিচ্ছু, তাকে তুমি সাঙ্ঘাতিক মারাত্মক খবর দিয়ে দিলে ভুজঙ্গ !

এখবরটা তোমার অস্বীকার করবার উপায় নেই—আমি নিজের কানে তোমার এই অমূল্য উপদেশ শুনেছিলাম। কাজেই তখন আর ধৈর্য্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি, সঙ্গে-সঙ্গে তোমারই মৃত্যুবাণ তোমাকে উপহার দিতে হয়েছিল। কিন্তু বরাৎ ভাল তোমার, মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় তোমার জান্টা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ ?—আজকে যদি আমি কোন একটা মারাত্মক কাজে হাত দেই,—অর্থাৎ সোজা কথায়, আজ এই মুহূর্ত্তে তোমাকে যদি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার মৎলব করি,—তাহলে আজ বাঁচবে কেমন করে ভুজঙ্গ ? শঙ্কর গোয়েন্দা আমার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েও, মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। পৃথিবীর একটা বড় পাপ এতদিনে নির্ম্মূল হয়েছে !

তবে শঙ্কর গোয়েন্দা মরবার আগেও একটা অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব করে গেছে। সেজন্য তাকে আমি তারিফ না করে পারছি না। সারা ভারতবর্ষ তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান করে সে এক অপূর্ব্ব পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী আবিষ্কার করেছে—যে নাকি আর্সেনিক গ্যাসের ক্রিয়াও নস্ট করে দিতে পারে, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারে। তারই কৃপায় হতভাগা অমর

চৌধুরী আবার জীবন লাভ করে উঠেছে! একথা তুমিও নিশ্চয়ই শুনেছ ভুজঙ্গ!"

"হাঁ, শুনেছি।" ভুজঙ্গ সংক্ষেপে জবাব দিল।

আবার কথা শোনা গেল, "শুনেছ তা জানি। কিন্তু একবার যে মরেছে, তার আবার বাঁচা কেন? কাজেই শাজাদা হুসেন আবার একটা শেষ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু শঙ্করের এক প্রেতাত্মা—তার এক সাহায্যকারী কাজটা পণ্ড করে দিয়েছে। তারই ফলে তাঁকে গাঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে; এখন পর্য্যন্ত তিনি এসে পৌঁছেন নি। তিনি এলেই, তোমার সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

ভুজঙ্গ কঠিন স্বরে বলল, "তুমি আমায় ভয় দেখাতে এসেছ মিঃ বোস?"

মিঃ বোস বললে, "ভয় নয়, নিছক সত্যি কথা বলতে এসেছি। পুলিশের কাছে তুমি এই মিঃ বোসকে নরঘাতকের আকারে দাঁড় করিয়েছ; শাজাদাকেও এই খুনের সাথে জড়িয়ে ফেলেছ। শঙ্কর মরেছে বটে, কিন্তু সে যতটুকু জানতে পেরেছিল, সবই হয়ত তার পুলিশ-বন্ধুরা জানে। তারা নিশ্চয়ই শাজাদা আর মিঃ বোসকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু আজ এই আতঙ্কের কারণ কে? পুলিশকে আজ কে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে?—সে হচ্ছ, তুমি।"

ভুজঙ্গ বলল, "তোমার বিবেচনায় হয়ত তাই হবে। কিন্তু বল দেখি মিঃ বোস, পুলিশ তোমায় গ্রেপ্তার করেছে,

এমন একটা মিথ্যা খবর আমাকে উপহার দেবার কারণ কি? ঐ খবরটা সত্যি বলে মনে করেছিলুম বলেই ত ব্যাপারটা এমন ফেনিয়ে উঠেছে! এই মিথ্যা খবরটা দিয়েছিলে কেন, তা আমি আজ জানতে চাই মিঃ বোস!"

মিঃ বোস বলল, "তোমার লাটসাহেবী প্রশ্নের ধরণে বড়ই বাধিত হয়েছি ভুজঙ্গ! কিন্তু মনে রেখো, এই মিঃ বোস পৃথিবীতে কখনো কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।"

বিদ্রূপের স্বরে ভুজঙ্গ বলল, "হাঁ, আজ তুমি তাই বলবে বটে! গরীবের ছেলে, রাস্তার একটা ভিক্ষুক ছিলে। তোমার চেহারায় মুগ্ধ হয়ে নিজের সাহায্যকারী করে নিই। তারপর আঙ্কিমের গোপন ব্যবসায় শাজাদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে, তোমাকে উচ্চ বেতনে তাঁর সেক্রেটারী করিয়ে দেই।

শাজাদার আর্থিক দুরবস্থার সময় আমিই প্রথম তাঁকে পরামর্শ দেই যে, সামান্য দশ-বিশ হাজার টাকা দামেও তিনি যদি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি, ময়ূরকণ্ঠী হার বিক্রী করে ফেলেন, তাহলে আমিই আবার এমন ব্যবস্থা করে দেব, যাতে তিনি আরো হাজার কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করতে পারেন।

শাজাদাকে সমস্ত প্ল্যানটা বলায়, তিনি তাই করলেন। বিশ হাজার টাকায় তিনি তাঁর হারছড়া এক মণিকারের কাছে বিক্রী করেন। মণিকার বেশী লাভ করবার আশায় সেটি নিলামে চড়িয়ে দিলে। আর আমি ইতিমধ্যে বোম্বাই থেকে দাদাকে চিঠিপত্র লিখে এমন একটা ঐতিহাসিক রত্ন—ময়ূরকণ্ঠী

হারের দিকে দাদার ঝোঁকটা বাড়িয়ে দিলুম। আগেই আমার জানা ছিল, দাদা এসব বিষয়ে যেন ক্ষেপে যান!

হলও তাই। দাদা উন্মত্তের মত হারটা কিনে নিলেন। দাম বাড়াবার জন্য শাজাদাকেও আমি কিছু উস্কে দেই। কিন্তু এত সব করলুম কেন মিঃ বোস? সে ত' তোমার অজানা নয়।

একটা সর্ত্ত হল, ঠিক সেই রাত্রেই তোমরা হারটা চুরি করে সরিয়ে ফেলবে। সেজন্য দুটো গ্যাস তোমায় দেওয়া হল। আমারই আবিষ্কৃত। কথা হল, ওপিয়ম্ গ্যাস দিয়ে দাদাকে অচৈতন্য করে তোমরা মালটা সরিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করবে। দৈবাৎ যদি কোন বিপদে পড়, কেবল সেই আশঙ্কায়ই আর্সেনিক গ্যাস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দাদাকে হত্যা করবার জন্য নয়।

রীতিমত লিখিত সর্ত্ত হল যে, হারছড়া সরিয়ে এনে আমাকে দিবে, আর আমি তোমাদের পারিশ্রমিক বাবদ বিশ হাজার টাকা দিব। কাজেই আমিও সামান্য দামেই হারছড়া পেয়ে যাব—শাজাদারও লাভ হবে চল্লিশ হাজার টাকা।

কিন্তু তোমরা করলে কি ভুজঙ্গ? আমার মহাদেবের মত নিরীহ দাদাকে একেবারে খুন করে ফেললে! তারপর আজ পর্য্যন্তও হারছড়া আমায় দাওনি!

শাজাদাকে আমি জানি। তিনি এতটা নীচ ও ছোট অন্তঃকরণের লোক নন। কিন্তু তুমিই তাকে এমন খেলো করে ফেলেছ মিঃ বোস!"

"বেশ, করেছি ত' করেছি। এখন আরো কি করতে চাই শোন।" দৃঢ়স্বরে মিঃ বোস বলল।

আবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ "শোন ভুজঙ্গ! যে কোন কারণেই হোক্, একটা বিষয়ে আমরা বড্ড ঠকে গেছি।

আমাদের সম্বন্ধে তুমি তোমার দাদাকে সাবধান করে দিয়ে বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদের অভিনয় করেছ কিনা, তা সঠিক্ জানতে পারিনি এখনো। তা যেদিন জানতে পারব, সেদিন পৃথিবীর চেহারা তোমার চোখে দেখাবে অন্যরূপ। কাজেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভয় না দেখিয়ে তোমাকে শুধু এই কথাটি বলছি ভুজঙ্গ, তোমার ও আমাদের মধ্যে যে চুক্তিপত্র হয়েছিল ঐ হারছড়াটির সম্বন্ধে, সেই কাগজখানা আমি ফেরৎ চাই। তা যদি দিতে ইচ্ছা না কর, তাহ'লে যে হারছড়া আমরা তোমার দাদার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি, তা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি,—তুমিও তোমার প্রতিশ্রুত বিশ হাজার টাকা দাও।

কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি ভুজঙ্গ, এই হার ছড়ার বদলে, তুমি কখনো বিশ হাজার টাকা দিতে রাজী হবে না; কারণ, হারছড়া জাল, এটা সেই আসল ময়ূরকণ্ঠী হার নয়।"

এই বলে সে তার পকেট থেকে একছড়া হার বের করে ভুজঙ্গের সম্মুখে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ভুজঙ্গ অতিমাত্র কৌতূহলী হয়ে হারছড়া তৎক্ষণাৎ প্রায় লুফে নিলে। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সেটি পরীক্ষা করেই গর্জ্জন করে উঠল, "মিথ্যাবাদী শয়তান! আজ দশ-বারো দিন

পরে তুমি আমায় একটা নকল হার দিয়ে ভুলাতে এসেছ? আমি তোমাদের কিছুমাত্র ক্ষমা করব না মিঃ বোস! তোমাদেরই সই-করা কাগজ পুলিশের হাতে দিয়ে আমি প্রমাণ করে দেব যে, আমার দাদার মৃত্যুর জন্য কোন্ কোন্ মহাপুরুষ

শান্তভাবে মিঃ বোস বলল, "কিন্তু তাতে ফল কি হবে জান? প্রমাণ হয়ে যাবে যে, এই ব্যাপারে তুমিও জড়িত, কাজেই তোমার সঙ্গে অমন একটা চুক্তিপত্র হয়েছিল। তুমি কি তখন স্বাধীনভাবে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে মনে করেছ?"

উত্তেজিত স্বরে ভুজঙ্গ বলল, "না, তা আমি করি না। হার-চুরির ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার জন্য হয়তো আমারও পাঁচ-সাত বছর জেল হয়ে যাবে।

হোক্, তাতে ক্ষতি নেই। যে কাজ আমি করেছি, তার জন্য আমার কিছু সাজা হওয়া দরকার। কিন্তু একথা আমি প্রমাণ করে দেব যে, আমি খুনী নই—আমি খুন করতে উৎসাহিত করি নাই। তোমরা—অতি উৎসাহীর দল, তাঁকে মিছামিছি জন্মের মত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে। আমি প্রমাণ করে দেব মিঃ বোস,—"

বাধা দিয়ে মিঃ বোস বলল, "থাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করবার সময় আমার নেই। আমি কেবল জানতে এসেছি, তুমি সেই কাগজখানা আমায় দেবে কি না!"

এই বলে ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে সে ভুজঙ্গের দিকে তাকিয়ে

রইল। সে দৃষ্টির কাছে ঘরের উজ্জ্বল আলোটা পর্য্যন্ত যেন মলিন ও নিষ্প্রভ হয়ে গেল!

খানিকক্ষণ নীরব থেকেই মিঃ বোস আবার কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, "আমি জবাব চাই ভুজঙ্গ, জবাব দাও শীগ্‌গির। আমি এখানে বৃথা সময় নষ্ট করে খেলা করতে আসিনি ভুজঙ্গ!"

ভুজঙ্গের মুখ ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করল। সে তার মানসিক ভয় দমন করে বলল, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারলাম না বন্ধু! সেই কাগজ তোমরা পাবে না—আমি দিব না। আর একটা কথা জেনে রেখো মিঃ বোস! সেই কাগজখানি আমার কাছে রাখব এমন মূর্খ আমি নই। আমাকে চূর্ণ করবার সদিচ্ছা কোনদিন তোমাদের মনে উদয় হতে পারে, এটুকু আশঙ্কা করে, আমি আগে থেকেই তা অন্যত্র সরিয়ে রেখেছি। আর একথাও জেনে রাখ, আমার কোনও ক্ষতি করলে তোমরাও নিষ্কৃতি পাবে না। যে মুহূর্ত্তে আমার কোনও ক্ষতি হবে, তার পর-মুহূর্ত্তেই সেই কাগজ পুলিশের হাতে পড়বে—এই রকম একটা সুবন্দোবস্ত আমি আগেই করে রেখেছি। আমি তোমায় বৃথা ভয় প্রদর্শন করছি না, একথা তুমি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পার। তোমাদের কবল থেকে উদ্ধার পেতে হলে এছাড়া আর অন্য কোনও পথ আমার ছিল না।"

উত্তর এলো, "তোমার কাছে এই রকমই একটা কিছু শুনতে পাব, একথা আমি আগেই জানতাম। এবং সেইজন্যে আমি

সম্পূর্ণ তৈরী হয়েই এখানে এসেছি ভুজঙ্গ! আমাদের হিসাব-নিকাশ আজ তাহলে এখানেই শেষ হবে।"

এই বলে সে তৎক্ষণাৎ তার জামার ভেতর থেকে কাঁচের কি একটা জিনিষ টেনে বার করল। কিন্তু তখনই—খুব সামনেই—কোথাও 'হিস্' করে একটা শব্দ হল। পর-মুহূর্ত্তেই কাঁচ ভাঙ্গার একটা ঝন্-ঝন্ শব্দ!

আগন্তুক এতক্ষণ উঁকি মেরে দেখছিল। শব্দ শুনেই সে বুঝে নিলে, কোনো অদৃশ্য হস্ত সাইলেন্সার-যুক্ত পিস্তল দিয়ে মিঃ বোসের বিষবাষ্প-পূর্ণ টিউবটি চূর্ণ করে দিয়েছে। কি যে এর ফল হতে পারে, তার খানিকটা বুঝে নিয়েই যেন আগন্তুক দম্‌বন্ধ করে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। ওপরে কাঁচের আধারে বন্দী মৃত্যুদূত মুক্তি পেয়েছে। সেখানে থাকলে তার আলিঙ্গন পেতে বিন্দুমাত্র দেরী হবে না।

নীচে নেমে বাইরের ঘরে আসতেই সে সিঁড়িতে একটা দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। একটা লোক দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সেই ঘরেই এসে ঢুকল।

তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই আগন্তুক সাহসে ভর করে হাতের টর্চ্চটা জ্বেলে সেইদিকে ফেলতেই দেখতে পেল, সে আর কেউ নয়—লোকটি মিঃ বোস।

টর্চ্চের আলো তার ওপর পড়তেই লোকটা থমকে দাঁড়াল। হাতে তার উদ্যত পিস্তল।

পরক্ষণেই কঠিন একটা কিছুর আঘাতে আগন্তুকের হাতের টর্চ্চের কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সশস্ত্র আগন্তুকও আর কিছুমাত্র চিন্তা না করেই অন্ধকারে আন্দাজে সেইদিক লক্ষ্য করে গুলি করল।

গুলি করবার সাথে-সাথে ঘরের মেঝেতে ধপ্ করে একটা ভারী কিছু পড়ার শব্দ শোনা গেল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি ভেবে আগন্তুক মনে-মনে একটু আনন্দিত হল। তারপর অন্ধকারে সেদিকে অগ্রসর হয়ে আন্দাজে চারদিক হাতড়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই! চারদিক শূন্য!

আগন্তুক মনে-মনে তার নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিল। গুলির আঘাতে মিঃ বোস মোটেই আহত হন নি। আহতের ভাণ করে আগন্তুককে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখেই সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে।

আগন্তুক বুঝলে, ভুজঙ্গের সাথে মিঃ বোসের সমস্ত কিছু বোঝাপড়াই আজ এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কোন অদৃশ্য বন্ধু সাইলেন্সার-যুক্ত পিস্তলের সাহায্যে ভুজঙ্গকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

এই অদৃশ্য বন্ধু কে, সেটা বুঝতে না পেরে, আগন্তুক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল!

এর পর নিঃশব্দে সে যখন পথে বেরিয়ে এলো, আকাশে তখন ঊষার হাল্কা আলো উঁকিঝুঁকি দিতে সুরু করেছে। তখন ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই।

সতেরো

বিপদের অনুসরণে

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে দাশুবাবু সবে তাঁর ভুঁড়ি দুলিয়ে বিলাসপুরের থানায় শুয়ে আছেন, এমন সময় এক কনস্টেবল্ এসে তাঁকে সেলাম করে বললে, "একখানা চিঠি আছে,—জরুরী চিঠি।"

দাশুবাবু চিঠিখানি খুলে ফেললেন।

চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত—খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র গুটি-দুই লাইন তাতে লেখা রয়েছে।

> "ভুজঙ্গ বিপন্ন—সম্ভবতঃ বিপন্ন। বিশালগড়ের পথে, মোটর-গাড়ীর দাগ অনুসরণ করে তার খোঁজ করবার চেষ্টা করুন। গোপনে পুলিশ-বাহিনী সঙ্গে রাখবেন।"

দাশুবাবু চম্‌কে উঠ্‌লেন—ভুজঙ্গের পরিণাম যে কি হতে পারে, তা ভেবে তিনি শিউরে উঠ্‌লেন।

তখনই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। তিনি দারোগা ও জমাদারকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে ভুজঙ্গের বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন।

বাড়ীর দরজায় এসে খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর একটা চাকর বাইরে বেরিয়ে এল। তাকে দেখতে পেয়ে দাশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ভুজঙ্গবাবু বাড়ী আছেন?"

চাকরটার চোখে মুখে একটা ভয় এবং সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। সে সন্দিগ্ধ স্বরে জবাব দিল, "আজ্ঞে না! তিনি সকালেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন।"

দাশুবাবু বললেন, "তোমার ভয় নেই, সত্যি কথা বল। আমি থানা থেকে আসছি।"

দাশুবাবুর কথায় খানিকটা সাহস পেয়ে চাকরটা বলল, "বাবু যে বাড়ী নেই একথা সত্যি। সকাল বেলায় কার একটা চিঠি পেয়ে তিনি খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছেন।"

দাশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "চিঠি নিয়ে কে এসেছিল জান?"

চাকরটা বলল, "আজ্ঞে চিঠিটা কেউ নিয়ে আসেনি। সেটা আজ সকালে চিঠির বাক্সে পড়ে থাকতে দেখে আমিই তা বাবুকে দিয়ে আসি। চিঠিটা পড়েই তিনি বেরিয়ে যান।

মনে হয় যে তিনি দূরেই কোথাও গেছেন। কারণ তিনি মোটরে গেছেন, আর এই দিক্ দিয়ে বিশালগড়ের রাস্তায় চলে গেছেন।"

দাশুবাবু বললেন, "আচ্ছা বলতে পার গাড়ীখানি কোন্ রঙের? তাতে লোক ছিল ক'জন? কি রকম তাদের চেহারা?"

চাকরটা জবাব দিল, "গাড়ীখানি কালো রঙের, আর বুড়োমতন একজন লোক তাই চালিয়ে নিয়ে এসেছিল। তা ছাড়া আর কেউ সে গাড়ীতে ছিল না।"

দাশুবাবু আবার বললেন, "আচ্ছা, আমায় আর একটা কথার জবাব দাও। তোমার বাবু ত' চিঠি পড়ে বাইরে বেরিয়ে

এলেন। চিঠিখানি যে কে দিয়ে গেছে, তা তুমি জান না,—সেটি চিঠির বাক্সে পড়ে ছিল তুমি বল্‌ছ! কিন্তু মোটর গাড়ীটা ছিল কোথায়? ভুজঙ্গবাবু কি আগে থেকেই কোন গাড়ীর বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন?"

চাকরটি বলল, "না। কাল সারারাত তিনি এমন সব কাজে ব্যস্ত ছিলেন যে, প্রায় ভোর বেলায় তিনি বিছানায় শোন্। কাজেই তাঁর পক্ষে কোন গাড়ী বন্দোবস্ত রাখা অসম্ভব। আর তাহলে, আমি তা নিশ্চয়ই জানতে পারতুম। গাড়ী-ঘোড়া ডাকাতে হলে তিনি আমাকে দিয়েই ত' ডাকান। আমার মনে হয় ঐ চিঠি আর গাড়ীর সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ ছিল। গাড়ীখানা কোথাও অপেক্ষা করছিল। চিঠিতে হয়ত তা লেখা ছিল। বাবু বাইরে এসে এদিক্-ওদিক্ তাকাতেই সেই কালো রঙের মোটর গাড়ীটা ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। আমি গাড়ীর দরজা খুলে দিলুম, বাবু তাতে উঠে বসতে না-বসতেই ভোঁ করে তা বেরিয়ে চলে গেল।

এই যে দেখুন, এখনো সেই গাড়ীর দাগ দেখা যাচ্ছে।"

চাকরটা আঙ্গুল দিয়ে গাড়ীর চাকার দাগ দেখিয়ে দিল। দাশুবাবু দেখলেন, তা তখনো সত্যই সুস্পষ্ট!

তিনি তখনই চাকার দাগ অনুসরণ করে তাঁর ঘোড়া হাঁকিয়ে, সেই পথে ছুটে চল্‌লেন। খানিক পরেই দেখা গেল, নানারকম মাল-বোঝাই ও কুলী-বোঝাই একখানি মোটর-লরী চারদিক ধূলায় অন্ধকার করে সেই পথে ছুটে গেল।

আঠারো

নারকীয় বৈজ্ঞানিক

জ্ঞান হারিয়ে দাশুবাবু কতক্ষণ ছিলেন, তা বলা কঠিন। তাঁর জ্ঞান হলে তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, একখানি উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে একটা উঁচু টেবিলের ওপর তিনি শুয়ে আছেন। ঘরের চারপাশে বড়-বড় আলমারী; তাতে নানা জাতীয় ওষুধ-পত্র এবং হরেক রকম কাঁচের যন্ত্রপাতি।

তিনি এখানে কেমন করে এলেন? এই প্রশ্ন মনে হতেই ধীরে-ধীরে সব কথা তাঁর মনে হতে লাগল।

ওঃ! কি দারুণ রাতই না তিনি ভুজঙ্গের বাড়ীতে কাটিয়েছেন! আর্সেনিক গ্যাস্ দিয়ে খুনীর দল অমরবাবুকে খুন করেছিল; গত রাত্রিতে তাঁরই চোখের সম্মুখে আবার একটা খুন হয়ে যেত সন্দেহ নেই! এবারে খুন হত অমরবাবুর ভাই —ভুজঙ্গ চৌধুরী।

কিন্তু ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে ভুজঙ্গের বাড়ী ঢুকবার সময় তিনি একটা সাইলেন্সার-যুক্ত রিভলভার সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন! নইলে তাঁরই চোখের সামনে যে একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে যেত, দাশুবাবু তা ভাবতেও শিউরে উঠলেন।

কিন্তু দাশুবাবু বহু চিন্তা করেও একটা বিষয়ের সমাধান করতে পারলেন না। গ্যাস-নলটা ফাটিয়ে দেবার খানিক পরেই

তিনি একটা গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন। সে গুলিটা করেছিল কে? আর কাকে করেছিল?—ভুজঙ্গ অক্ষত; সে বাড়ীতে আর কেউ আহত হয়েছে, এমন খবরও ত জানা যায়নি! তা হলে সে গুলিটা হল কিসের?

তারপর আর একটা কথা।—এই যে ছোট্ট চিঠিখানি থানায় কেউ দিয়ে এলো, সে লোকটাই বা কে? তাহলে কি আমাদের অজানা শত্রুর মত, অজানা মিত্রও কেউ আছেন নাকি? কে তিনি? এবং কি তাঁর স্বার্থ?

ধীরে-ধীরে তাঁর আরো অনেক কথা মনে হতে লাগল।

ঘোড়ায় চড়ে তিনি বিশালগড়ের পথ ধরে আস্‌ছিলেন মোটর গাড়ীর চাকার দাগ অনুসরণ করে। এক বৃদ্ধা কাঠের বোঝা মাথায় করে রোদে দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল। দাশুবাবু গেলেন তাকে সাহায্য করতে, বোঝাটা নামিয়ে দিতে।

বোঝাটা নামানো হলে, দু-চারটি কৃতজ্ঞতা-সূচক কথা বল্‌তে-বল্‌তে বৃদ্ধা সহসা তাঁকে কঠিন একটা কিছু দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেছিল। কেবল এই পর্য্যন্তই দাশুবাবুর মনে আছে। সম্ভবতঃ এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তারপর অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁকে বোধহয় এইখানে আনা হয়েছে।

দাশুবাবু উঠে বসতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। অবাক হয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর হাত দুটো শক্ত করে টেবিলের সাথে বাঁধা, আর পায়ের অবস্থাও তাই।

তাঁর ঠিক পাশেই কারও একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনে

তিনি ডান দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁরই মতন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর পাশের টেবিলে শুয়ে আছে স্বয়ং ভুজঙ্গ।

ভুজঙ্গ তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে? আপনি আবার এখানে এসে হাজির হলেন কোত্থেকে?"

দাশুবাবু বললেন, "সঙ্ক্ষেপে কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, আমি আপনার বন্ধু। আপনাকে বাঁচাতে এসেই আমার আজ এই অবস্থা! আচ্ছা ভুজঙ্গবাবু! আপনি এমন নির্ব্বোধের মত এই শয়তানের হাতে এসে ধরা দিলেন কেন?"

একজন অপরিচিতের মুখে ভুজঙ্গ নিজের নাম শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হল। কিন্তু সে তার বিস্ময়ের ভাব দমন করে বলল, "আমি শাজাদা হুসেনের একটা চিঠি পেয়ে এখানে এসেছিলাম।"

দাশুবাবু ভয়ানক ভাবে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "শাজাদা হুসেন?"

ভুজঙ্গ বললে, "হাঁ, শাজাদা হুসেন। লোকটা বদ্ধ জুয়াড়ী ও বে-আইনী আফিমের ব্যবসাদার। কোনোকালে তার কোন পূর্ব্বপুরুষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নাকি ছিলেন সম্রাট্ ঔরংজীব! বোধ হয়—সে সম্পূর্ণ একটা ধাপ্পা......"

বাধা দিয়ে দাশুবাবু বললেন, "সে সব আমি জানি; বলে সময় নষ্ট করবেন না। সময় খুব অল্প। এর মাঝে আপনি বলে ফেলুন যে শাজাদার চিঠিতে কি এমন লেখা ছিল, যার মোহে আপনি গত রাত্রির অনিদ্রা ও উদ্বেগ উপেক্ষা করেও তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে এলেন!"

ভুজঙ্গ অভিভূত ভাবে বলল, "তাহলে গত রাত্রির সব কথা আপনি জানেন?"

—"হাঁ জানি। এখন আর যা জানতে চাই তা বলুন।"

ভুজঙ্গ বলল, "শাজাদার চিঠিতে ছিল যে, তিনি এইমাত্র অতি কষ্টে কলকাতার এক বিষম বিপদ্ থেকে পালিয়ে এসেছেন। বৃদ্ধ মোটর-ড্রাইভারের সাজে তিনি গাড়ীতে বসে আমার প্রতীক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে দেখা করা তাঁর বিশেষ দরকার।

শাজাদাকে আমি এতটা খারাপ মনে করি না, যতটা খারাপ ও হিংস্র মনে করি তাঁর সেক্রেটারী মিঃ বোসকে। কাজেই চিঠিখানি মিঃ বোসের হলে আমি নিশ্চয়ই বেরুতাম না। বিশেষতঃ গত রাত্রের নায়কই ছিল মিঃ বোস।

আমি মনে করলুম, শাজাদার সঙ্গে মিঃ বোসের নিশ্চয়ই এখন পর্য্যন্ত দেখা হয়নি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এখন আর ভয় কি? তাই মনে করে, সরল বিশ্বাসে আমি গাড়ীতে উঠি। বৃদ্ধ ড্রাইভারকেই আমি ছদ্মবেশী শাজাদা বলে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু গাড়ীতে উঠেই দেখি—ও বাবা! বৃদ্ধ ড্রাইভারই ছদ্মবেশী মিঃ বোস! রাত্রিতে আমার কোন অজ্ঞাত বন্ধুর জন্য আমাকে শেষ করতে না পেরে, অবশেষে কৌশলে আমাকে হাত করেছে।

তবে এখন অবশ্য দুই দেবতাই উপস্থিত আছেন। শাজাদা ও তাঁর শয়তান সেক্রেটারী দু'জনেই এখন বর্ত্তমান। এখন

কেউ কারো চেয়ে কম যাবেন না। আমারই বিজ্ঞানের ছাত্র ও সহকারী মিঃ বোস আজ আমারই বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাকে নৃশংস অত্যাচার করে, অবশেষে পৃথিবী থেকে নির্ব্বাসিত করবে। তাই দেখছেন না, টেবিলের ওপর কত-কি যন্ত্রপাতি ও অষুধ-পত্তর সাজানো রয়েছে!"

দাশুবাবু বললেন, "অত্যাচার এরা হয়তো করবে খুবই। কিন্তু একটু শুধু সান্ত্বনার কথা এই যে, এর আশে-পাশে নিশ্চয়ই একদল পুলিশ আমার প্রতীক্ষা করছে। তারা যদি সন্দেহ করে, তা হলে যদি বাঁচবার পন্থা হয়। তারা তা হলে ভেতরে ঢুকে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করবে।"

ভুজঙ্গ বিষাদের হাসি হেসে বলল, "পুলিশ আসা আর না আসা একই কথা। কারণ, বাড়ীটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলেও তারা হয়ত এই গুপ্ত ঘরের সন্ধানই পাবে না। ঘরটা মাটির তলায় অবস্থিত।"

ভুজঙ্গের এই কথা শুনে দাশুবাবু এবার ভীত হলেন। তাহলে কি তিনি মৃত্যুর মুখেই ছুটে এসেছেন স্বেচ্ছায়? পুলিশ এই ঘর খুঁজে না পেলে তাদের মৃত্যু একেবারে অবধারিত। এই খুনে' বৈজ্ঞানিকের কবল থেকে কারোই নিস্তার নেই।

এই সময় দরজার বাইরে কারো পায়ের শব্দে তারা দুজনেই চুপ করে রইল। পাশের একটা দরজা দিয়ে প্রথমে ঢুকলেন শাজাদা হুসেন। তার পেছনে ঢুকল মিঃ বোস।

শাজাদা ঘরে ঢুকেই তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন,

"বাঃ! এতক্ষণ পরে তোমাদের জ্ঞান হয়েছে দেখছি! সামান্য একটা আঘাত সামলাতেই যার ছয় ঘণ্টা কেটে যায়, সে এসেছে শয়তানিতে আমাদের সাথে পাল্লা দিতে! হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

শাজাদার হাসিতে দাশুবাবুর বুক কেঁপে উঠল। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের দিয়ে তুমি কি করতে চাও? আর এভাবে টেবিলের সাথে হাত-পা বেঁধে রাখবার উদ্দেশ্যই বা কি?"

শাজাদা বললেন, "ধীরে, বন্ধু, ধীরে। এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? পুলিশের লোক তুমি। কিন্তু এখানে পুলিশী মেজাজ দেখালে ত চল্‌বে না। তোমার আর এক বন্ধু শঙ্কর সেনও এম্‌নি পাল্লা দিতে এসেছিল। কিন্তু আজ সে কোথায়? বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দেখাবার জন্যেই তোমাদের এখানে আনা হয়েছে। আর্সেনিক গ্যাসের অপূর্ব্ব ক্রিয়া তুমি আগেই দেখেছ। এখন দেখাব অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলো। কিন্তু তার আগে কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর চাই তোমার কাছ থেকে।"

দাশুবাবু বললেন, "জিজ্ঞাসা কর।"

শাজাদা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কিসের সন্ধানে বিলাসপুরে এসেছিলে সত্যি করে বল।"

দাশুবাবু বললেন, "হাঁ, সত্যি কথাই বলব। গোয়েন্দা শঙ্কর সেন তার মৃত্যুর আগে বলে গেছে, ভুজঙ্গের জীবন বিপন্ন। দুটো বদ্‌মায়েস—শাজাদা হুসেন ও তাঁর সেক্রেটারী মিঃ বোস যে-কোন মুহূর্ত্তে তাকে বিপদে ফেলতে

পারে। কাজেই আগে তাকে রক্ষা করে, পরে ও-দুটোকে গ্রেপ্তার করা—এই ছিল আমার ওপর নির্দ্দেশ।"

কথাটা শুনেই শাজাদা ও মিঃ বোসের কণ্ঠ হতে একটা গভীর তাচ্ছিল্যের হাস্য বেরিয়ে সবাইকে সচকিত করে দিল।

শাজাদা হুসেন বললেন, "তোমাকে শত্রু হিসেবে পেয়েও আনন্দ আছে। তুমি তাহলে তোমার মৃত বন্ধুটির কৃপায় আমাদের সব কিছুই জান দেখছি! সুতরাং তোমার মৃত্যুতে আমি নিশ্চিন্ত হব। তোমার মুখ থেকে এই গোপন কাহিনী আর কখনো বাইরে প্রকাশ হবে না। কিন্তু এখন তাহলে আসল কাজ সুরু হোক্। আমাদের প্রথম কাজ হবে ভুজঙ্গকে নিয়ে। বলুন ভুজঙ্গবাবু, সেই চুক্তিপত্রখানা আমাদের ফিরিয়ে দেবেন? আপনার কাছে না থাকলে, কোথায় আছে তা বলে দিন; আমরা বের করে নেব।"

ভুজঙ্গ নীরব। তাকে নীরব দেখে শাজাদা বললেন, "মিছা-মিছি কেন কষ্ট পাবেন ভুজঙ্গবাবু? মরতে অবশ্য আপনাকে হবেই। কিন্তু সেই কাগজখানার সন্ধান দিলে সেই মৃত্যু হবে সহজ, যন্ত্রণাহীন।—বলুন, কি আপনি করতে চান?"

ভুজঙ্গ তথাপি নীরব। শাজাদা কোন কথা না বলে মিঃ বোসকে কি ইঙ্গিত করলেন!

মিঃ বোস সামনের একটা আলমারী থেকে একটা ছোট শিশি বের করে বলল, "এই শিশিটার ভেতরে কি আছে জান

ভুজঙ্গ ? উন্মাদ কুকুরের লালা থেকে এই আরক তৈরী করা হয়েছে তোমারই আবিষ্কৃত প্রণালীতে। এর সামান্য এক বিন্দু তোমাদের দেহের রক্তের সাথে মিশলে তোমরাও এক একটি উন্মাদ কুকুরে পরিণত হবে। ভুজঙ্গ, তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের পক্ষে এর চেয়ে কঠিন এবং উপযুক্ত শাস্তি আর কিছু আমি খুঁজে পেলাম না।"

এই বলে মিঃ বোস অগ্রসর হয়ে ভুজঙ্গের হাতের শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর হাতের ইঞ্জেকশনটা নিয়ে তৈরী হতেই তার পেছন থেকে কেউ কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, "যেমন ভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছ, ঠিক তেমনি ভাবেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক শয়তানের দল ! আগে তোমাদের নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত পুরস্কার পাবার জন্যে তৈরী হও, তারপর অন্যের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিও।"

শাজাদা মুখ ফিরিয়ে সেদিকে চাইলেন। মিঃ বোসও চমকে মুখ তুলে তাকাল। তার হাতের ইঞ্জেকশনটা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

সে দেখতে পেল তার ঠিক পেছনেই পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে শুধু চোখ-খোলা কালো মুখোশ-পরা এক মুর্ত্তি—মুখে তার অতি নির্ম্মম হাসি !

মিঃ বোস বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি ?"

মুর্ত্তি উত্তর দিল, "আমি তোমাদের যম। কেন, আমায় চিনতে পারছ না মিঃ বোস ? একবার তুমি আমায় জলে

ডুবিয়েছিলে—তোমার সৌম্য বৃদ্ধের ছদ্মবেশে মুগ্ধ হয়ে আমি বোকার মত তোমায় বিশ্বাস করেছিলুম !”

—“তবে,—তবে,—তুমি কি সেই গোয়েন্দা শঙ্কর সেন ?” মিঃ বোসের কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ বিস্ময় !

—“হ্যাঁ, আমিই শঙ্কর সেন—তোমাদের যম।”

—“শঙ্কর সেন !—শঙ্কর সেন জীবিত ?” শাজাদা হুসেন যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না !

মুখোশ সরিয়ে শঙ্কর সেন এবার তার স্বরূপ প্রকাশ করে বললে, “হাঁ শাজাদা, শঙ্কর সেন এখনো জীবিত। আপনার ত অনেক আগেই আমাকে চেনা উচিত ছিল শাজাদা ! সেদিন মুস্কিল-আসানের সঙ্গে যে আপনার অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হয়েছিল শাজাদা হুসেন ! অতক্ষণের গভীর আলাপ,—তা কি আজ এত সহজেই ভুলে গেলেন ? আমি যে সেই আকর্ষণেই আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।”

শাজাদা ও মিঃ বোসের দিক থেকে পিস্তলের লক্ষ্য না সরিয়ে, শঙ্কর ধীর পদক্ষেপে দাশুবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল ! তারপর তাঁকে মুক্ত করে সে ভুজঙ্গকেও মুক্ত করে দিল।

ভুজঙ্গ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সে মুক্তিলাভ করামাত্র হিংস্র গর্জ্জন করে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত মিঃ বোসের কাঁধের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

মিঃ বোসও অসাধারণ শক্তিশালী। পরস্পর লড়াই করতে-করতে দুজনেই ছিটকে পড়ল।

শঙ্কর এর জন্য তৈরী ছিল না। সে মিঃ বোসকে ভুজঙ্গের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য অগ্রসর হতেই মিঃ বোস পকেট থেকে একটা কিছু বের করে মুখের ভেতরে পূরে উন্মাদের মত হেসে বলল, "আমায় আটকে রাখতে পারলে না বন্ধু! বৈজ্ঞানিক মিঃ বোসকে বন্দী করা তোমাদের সাধ্য নয়। তাই সে তোমাদের ফাঁকি দিয়ে চলল। বি—দা—য়!"

মিঃ বোসের এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে সবাই কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শাজাদা হুসেনের কথাও বুঝি কারো মনে রইল না!

হঠাৎ একটা কাতর গোঙানির শব্দে সকলেরই চমক ভেঙ্গে গেল। মহাবিস্ময়ে সকলেই দেখলে, শাজাদা হুসেনও তখন ভূমিতলে লুটিয়ে কাতরাচ্ছেন।

তিনি যে কখন্ টেবিল থেকে কি একটা জিনিষ তুলে নিয়ে গিলে ফেলেছিলেন, কেউ তা লক্ষ্য করতে পারেনি।

* * *

মাল-বোঝাই লরীতে, খানিক দূরে কুলীদের ছদ্মবেশে যে-সব পুলিশ-কর্ম্মচারী অপেক্ষা করছিল, তাদেরই সাহায্যে দাশুবাবু সেই গুপ্ত আড্ডার সব-কিছু নিয়ে বিলাসপুরে ফিরে এলেন।

সকলেই অনুভব করলে যে, শাজাদা হুসেন ও মিঃ বোসকে জ্যান্ত গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে পারলে, সেদিন তাদের যে আনন্দোৎসব সম্পন্ন হত, পৃথিবীর কোন সম্রাটের অভিষেকেও বুঝি তেমন উৎসবের কল্পনা করা যায় না!

উনিশ

রহস্যের সমাধান

বিলাসপুরে ভুজঙ্গের ড্রয়িং-রুমে দাশুবাবু, শঙ্কর ও ভুজঙ্গের সাথে চা খেতে-খেতে গল্প করছিলেন। ভুজঙ্গ কৃতজ্ঞ ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের কি ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাব, তা আমার জানা নেই।

দাশুবাবু যদি ঠিক সময়মত সেদিন আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সাইলেন্সার-যুক্ত পিস্তল দিয়ে মিঃ বোসের হাতের টিউব ভেঙ্গে না দিতেন, আর শঙ্করবাবু যদি বিশালগড়ে উপস্থিত না হতেন, তাহলে যা হত,—উঃ! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে!"

শঙ্কর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, "কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের দুজনকে যে একটা ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি, এই যথেস্ট। তবে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দক্ষিণা যা দিয়েছিলেন, তা কিন্তু জীবনে ভুলব না।"

লজ্জিত হয়ে হাত যোড় করে ভুজঙ্গ বলল, "আর লজ্জা দেবেন না শঙ্করবাবু! বার-বার হাত যোড় করে ক্ষমা চাইছি!"

দাশুবাবু বললেন, "আচ্ছা ভুজঙ্গবাবু, একটা কথা আমি এখনো বুঝতে পারিনি। আপনি বলেছিলেন, আপনার ও শাজাদা হুসেনের মধ্যে যে চুক্তিপত্র হয়েছিল, তা এমন জায়গায় রেখে দিয়েছেন যে, আপনার মৃত্যু হলেই সে কাগজ যেয়ে পড়বে পুলিশের হাতে। এ কথার মানে কি ভুজঙ্গবাবু?"

ভুজঙ্গ বলল, "তার মানে হচ্ছে—আমি সে কাগজ একটা ক্যাশবাক্সে পূরে রেখে দিয়েছি ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের সেফ্ কাষ্টডিতে। তাদের উপদেশ দেওয়া আছে, কোন কারণে আমার যদি মৃত্যু হয়, তা হলে সেই ক্যাশবাক্সটি যেন পুলিশ-কমিশনারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে কাগজ পুলিশের হাতে গেলে, শাজাদা বা মিঃ বোস, কেউ নিরাপদে থাকত না।"

শঙ্কর বলল, "আচ্ছা বলতে পারেন ভুজঙ্গবাবু, শাজাদা একখানা রিক্‌শা-গাড়ী করে যাতায়াত করতেন কেন? আমি প্রমাণ পেয়েছি, হারচুরির দিনও তিনি অমরবাবুর বাড়ীর বাইরে রিক্‌শায় বসে ছিলেন।"

ভুজঙ্গ বললে, "হাঁ, আমি তা পরে শুনেছি।"

একটু হেসে সে আবার বলল, "তাহলে একটা গোপন কথা বলতে হচ্ছে মিঃ সেন!

শাজাদা তাঁর বে-আইনী আফিমের ষ্টক্ প্রায় সবটাই তাঁর সাথে-সাথে নিয়ে যেতেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি তাঁর একটা পায়ের একখানি হাড় কেটে ফেলেছিলাম। হাড়টার জায়গায় একটা রূপোর নল বসানো থাকত, আর তাতে ভর্ত্তি থাকত তাঁর আফিম। কিন্তু বাইরে থেকে সেই নলের অস্তিত্ব বুঝবার কোন উপায় ছিল না। তবে, খোঁড়া হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য। তাই কোনদিনই তিনি বেশী হাঁটতে পারতেন না—রিক্‌শা ব্যবহার করেই আরাম পেতেন।

এই রিক্‌শাও ছিল একটা চোরাই রিক্‌শা। এর আসল

নম্বর ছিল ৫৭; এক রিক্শা-কুলীকে দিয়ে তিনি এটা চুরি করিয়ে নেন। তারপর এমন একটা বন্দোবস্ত ছিল যে,—১, ২, ৩, এই তিনটি সংখ্যার সাহায্যে তিনি যে-কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন নম্বর এঁটে রিক্শা বার করতে পারতেন।

বিজ্ঞানটা আমিই তাদের কিছু শিখিয়েছিলুম বটে মিঃ সেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চুরি-ডাকাতিতে তাঁরা আমাকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন! তাদের দুজনের মাঝেও আবার মিঃ বোস ছিলেন অতুলনীয়।"

শঙ্কর বলল, "তা নিশ্চয়ই। সে কথা একশ' বার স্বীকার করব। কিন্তু এখনো দুটো জিনিষ হেঁয়ালীর মত রয়ে গেল। সে হচ্ছে রিক্শা-কুলী দুটোর মৃত্যু।

অমরবাবুর প্রায় সাথে-সাথে, তাদেরই নিজস্ব একটা কুলীকে হত্যা করা হল কেন? আর দ্বিতীয় কুলীটাই বা মারা গেল কেন? অসীমের গুলি ত তাকে কিছুমাত্র আঘাত করেনি!"

ভুজঙ্গ বলল, "তারও কারণ আছে মিঃ সেন! আমার দাদাকে হত্যা করেছিল সেই আগেকার রিক্শা-কুলী। মিঃ বোসের হাত তখন পর্য্যন্ত বেশী পাকেনি কিনা, তাই সে নিজে অগ্রসর না হয়ে অন্য একটা লোক নিযুক্ত করেছিল।

কুলীটা আর্সেনিক গ্যাসের সাহায্যে দাদাকে হত্যা করলে, মালটা সে হাত করলে। কিন্তু খুনের এতবড় একটা সাক্ষীকে কখনো জীবিত রাখা চলে কি? তাই পরক্ষণেই উদয় হল মিঃ বোস! সে আবার একটা আর্সেনিক গ্যাসের টিউব ছুঁড়ে

সেই কুলীটাকেও শেষ করে দিলে। তারপর হারটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

এই হল প্রথমকার কুলীর কথা। এইবার দ্বিতীয় কুলীর কথা শুনুন।

আপনারা ত একজন নকল অমর চৌধুরী সাজালেন। তার ফলে হল আবার একটা খুনের ষড়যন্ত্র। তখন আবার একটা রিক্‌শা-কুলীকে পাঠান হল অমর চৌধুরীকে খুন করবার জন্য। কিন্তু রিক্‌শার হাতলের ভেতর করা হল এক অপূর্ব্ব কৌশল।

হাতলের ভেতর আর্সেনিক গ্যাস এমন ভাবে পূরে দেওয়া হল, আর এমন ধরণের হল সেই গ্যাস যে, পার্ক সার্কাস থেকে মোহনলাল ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত রিক্‌শা টেনে নিতে গেলে ততক্ষণে রিক্‌শা-কুলীর দেহে ধীরে-ধীরে আর্সেনিক গ্যাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কাজেই, একটু আগে হোক বা পরে হোক,—রিক্‌শা-কুলী সেদিন আর বাড়ী ফিরে আসত না, নিশ্চয়ই, এমনি ছিল বন্দোবস্ত।

হতভাগা ঘরে যেয়ে ছাগলের ছদ্মবেশে অসীমবাবুকে দেখেই সন্দেহ করেছিল। তাই সে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তারও হয়ে এলো অন্তিম সময়। এতক্ষণের বিষ-ক্রিয়ার ফলে সে-ও আর জীবিত রইল না।

এসব ব্যাপারই আমি পরে জানতে পেরেছিলাম মিঃ সেন! আমার দাদাকে খুন করবে, সে কথা কি আমার কাছে কখনো আগে প্রকাশ করতে সাহস পায়?”

দাশুবাবু বললেন, "কিন্তু আর একটা রহস্যের আমি এখন পর্য্যন্ত কোন সমাধান করতে পারিনি ভুজঙ্গবাবু! সেদিন রাত্তিরে আপনার বাড়ীতে কে কাকে গুলি করেছিল?"

এবার মৃদু হেসে জবাব দিল শঙ্কর। সে বলল, "সে গুলিটা আমিই করেছিলাম দাশুবাবু! মিঃ বোসকে পালাতে দেখে আমি গুলি ছুঁড়ি। কিন্তু সে চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যায়।"

দাশুবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "বল কি শঙ্কর! সেদিন তুমিও তাহলে বিলাসপুরেই ছিলে?"

—"হাঁ দাশুবাবু! ভুজঙ্গবাবুর বাড়ীতে সেদিন একা আপনাকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নাই। কিন্তু অদৃশ্য ভাবে থাকাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। পরদিন প্রাতে ভুজঙ্গবাবুকে মিঃ বোস যখন চুরি করে নিয়ে যায়, তখনও আমি তাঁকে চোখে-চোখে রেখেছিলুম। তারপর ওঁকে অনুসরণ করবার জন্য আপনাকে একখানি ছোট চিঠি পাঠিয়ে, আমিও বিশালগড়ের পথে চলে যাই।"

গভীর বিস্ময়ে ভুজঙ্গ বলল, "আপনি যে তাহলে সর্ব্বময় বহুরূপী!"

ঈষৎ হেসে শঙ্কর বলল, "হাঁ আমি সর্ব্বময় বহুরূপী। কিন্তু একমাত্র আপনার জন্যই ত আমার এই বহুরূপ! আপনিই যে সব-কিছুর আদি-কারণ ভুজঙ্গবাবু!"

ভুজঙ্গ বলল, "সে কথা ঠিকই। হারছড়া চুরি করবার মৎলবটা আমিই দিয়েছিলুম। কিন্তু এত করেও হাতে এলো

একটা নকল হার! আসল হার যে কোথায় তারা সরিয়ে ফেলেছে, কে জানে?”

ঈষৎ হেসে শঙ্কর বলল, “আমি তা জানি ভুজঙ্গবাবু! আসল হার এই দলের কারো হাতে পড়েনি—সম্পূর্ণ সুরক্ষিতই আছে।”

—“কি বলছেন মিঃ সেন?” ভুজঙ্গের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও আগ্রহ ফুটে বেরুলো।

শঙ্কর বলল, “আসল হার রয়েছে নীলামকারী রবার্ট কোম্পানীর কাছে। ময়ূরকণ্ঠী হারটা কিনবার-আগ্রহ নিয়ে অমরবাবু নিলামের আগেই একদিন তাদের ম্যানেজারের সাথে দেখা করেন। ম্যানেজারকে বলেন, নিলামের দিন তিনি উপস্থিত হয়ে সে হারছড়া কিনবার চেষ্টা করবেন এবং যদি তিনি কিনতে সমর্থ হন, তাহলে একটা অনুরোধ তাঁদের রাখতে হবে। নিলাম-শেষে যখন তিনি চলে আসবেন তখন আসল হারটি না দিয়ে, তাঁকে যেন একছড়া নকল হার দেওয়া হয়। নইলে পথেই তাঁর জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হতে পারে।”

ম্যানেজার সম্মত হলে তিনি আসল ময়ূরকণ্ঠীর অনুকরণে একছড়া নকল হার তৈরী করিয়ে ম্যানেজারকে আগেই দিয়ে রাখেন। কাজেই নীলামে হার কিনে যখন তিনি চলে আসেন, তখন তাঁর সাথে এলো শ’ দুই টাকা দামের একছড়া নকল হার মাত্র! আর যত-কিছু হাঙ্গামা-হুজ্জুত হল, সবই হল কেবল নকল হারছড়ার জন্য!

সূক্ষ্মবুদ্ধি অমরবাবুর বুদ্ধিবলে সেই হার আজও নিরাপদে

রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'সুযোগমত আমিই এসে তা নিয়ে যাব। যদি কোন কারণে তা আমার পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তা হলে যেন সেই হার আমার ভাই ভুজঙ্গ চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

কাজেই ভুজঙ্গবাবু! সেই হার এখন আপনারই প্রাপ্য। আপনি এখন—"

—"দাদা! দাদা! এই হতভাগ্য অযোগ্য ভাইয়ের প্রতি তোমার এত ভালবাসা!—"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুবন্যায় অভিভূত হয়ে ভুজঙ্গ আবার কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "দাদা! দাদা! আমি কি সাঙ্ঘাতিক সর্ব্বনাশ করেছি দাদা! আমারই আবিষ্কৃত মৃত্যু-দূত তোমাকে আজ মরণের পথে টেনে নিয়ে গেল! এযে ভুলতে পারছি না দাদা—আমার স্নেহময় দাদা!—"

এতবড় দুর্জ্জয় শক্তিশালী ভুজঙ্গ সহসা আত্মহারা ও সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল।

দাশুবাবু তাকে তুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা দিয়ে শঙ্কর বলল, "না, না,—ও করবেন না দাশুবাবু! পাপী সে, পাপ করেছে,—আজ তাকে অনুতাপে শুদ্ধ হতে দিন, কাঁদ্‌তে দিন।

জ্ঞান তার ফিরে আস্‌বে এখনই; কিন্তু এবার যে জ্ঞান আসবে, তা হবে বিশুদ্ধ চন্দনের মত, দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। সে সুযোগ দিন দাশুবাবু! বাধা দেবেন না।"

শেষ